মৃত্যুর বিছানায়
ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

অনুবাদক পরিচিতি

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম।
সহজ সরল মেধাবী ও কর্মতৎপর একজন মানুষ। মাদরাসা-শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় বোর্ডপ্লেস করার মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি। কর্মজীবনে শিক্ষকতার পেশায় তিনি যে প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন, সেখানেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। মাঝে দুটি মাদরাসায় প্রায় ৮/৯ বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেও সুনাম কুড়িয়েছেন। এত অল্প বয়সেও তিনি এ পর্যন্ত যেসব সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত হয়েছেন, সবগুলোতে সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করেছেন।
তাঁর লেখালেখিতে প্রবেশের বয়স এখনও এক দশক হয়নি; কিন্তু মৌলিক, অনুবাদ এবং সম্পাদনা মিলিয়ে তাঁর অনেকগুলো বই ইতোমধ্যে বাজারে এসেছে। তাঁর অনুবাদ এত প্রাঞ্জল যে, সেটি তরজমা না কি মৌলিক লেখা- ঠাওর করা যায় না। আর মৌলিক লেখায় তো এমন রস দিতে পারেন যে, ধর্মীয় শুষ্ক বিষয়গুলোও তাঁর হাতে রসকদম্ব হয়ে ওঠে। মুহাম্মাদ আবদুল আলীম বর্তমানে ঢাকা গেণ্ডারিয়ার জামালুল কুরআন মাদরাসার মুহাদ্দিস। তাঁর জন্ম ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৮২ বাংলা সনে।
আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন।

মুহাম্মদ দিলাওয়ার হোসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

মূল
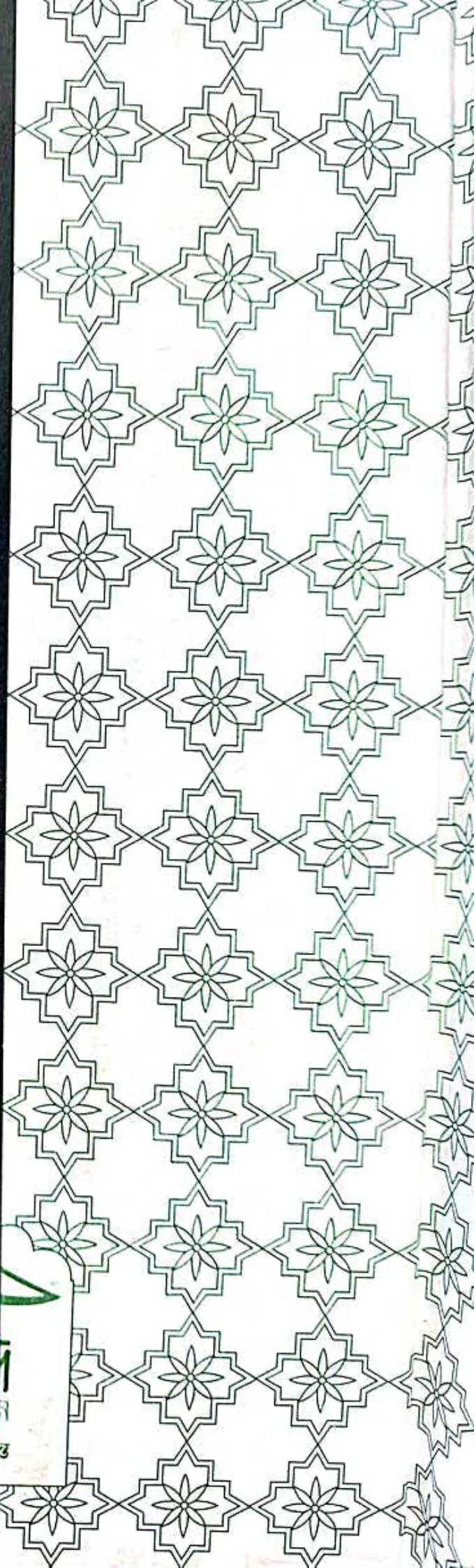
ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী

প্রভাষক, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদিআরব

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আলীম

মুহাদ্দিস, জামালুল কুরআন মাদরাসা

গেন্ডারিয়া, ঢাকা

আল্লাহর নামে শুরু করছি; যিনি অতিশয় দয়ালু ও মেহেরবান

আমাদের স্বপ্ন

আল-হামদু লিল্লাহ। মাঝে মাঝে পাঠকরা আমাদেরকে ফোন করছেন। ধন্যবাদ দিচ্ছেন। তাদের অভিব্যক্তি তুলে ধরছেন। সে দিন একজন জানালেন, হুদহুদের বই অন্যকে গিফ্‌ট করার মত। আরেক জন জানিয়েছেন, হুদহুদের বই পড়ে তিনি নিজের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব করছেন। কেউ কেউ হুদহুদের সমস্ত বই কেনার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন। ...

আমরা মনে করি, আপনি হুদহুদ পরিবারের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আপনি হুদহুদের বই পড়েছেন। হোক দু-চার হরফ। এ কথার মানে হচ্ছে জীবনের মূল্যবান সময় থেকে আপনি আমাদেরকে খানিকটা অংশ দিয়েছেন। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। জীবন পরিশীলনে আমরা আপনার আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাই। আপনি কি অনুগ্রহ করবেন?

বাংলা ইসলামী সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ– সাহিত্যের মান দুর্বল; তথ্য-উপাত্তের শতভাগ বিশুদ্ধতা অনিশ্চিত; কাগজ-মুদ্রণ বাজে; বাঁধাই নড়বড়ে। আরও বড় কথা, অনুবাদ আর অনুকরণের ছড়াছড়ি। এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছি। যেমন–

- সাহিত্যমান ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য একটি সেন্সর বোর্ড গঠন করেছি।
- সূচনা থেকেই উন্নত কাগজ-কালি ব্যবহার করে উন্নত প্রেসে বই-পুস্তক ছাপছি।

- সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভালো বাইন্ডার দিয়ে বই-পুস্তক বাঁধাই করছি।
- শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলিম সমাজের প্রয়োজন বিবেচনা করে মৌলিক রচনাবলি প্রকাশ করতে চেষ্টা অব্যাহত রাখছি।
- অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করে স্বীকৃত বিদেশী গ্রন্থাবলি অনুবাদের তালিকাভুক্ত করছি।
- দৃষ্টিনন্দন করার জন্য একাধিক রঙে বই-পুস্তক প্রকাশ করছি।
- পাঠকবন্ধুদের তালিকা দীর্ঘ করার জন্য সর্বোচ্চ কম দামে গ্রন্থাবলি বাজারজাত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, মুসলমানদের আন্তরিক দোআ প্রাপ্তি এবং দুনিয়াতে হালাল মুনাফা অর্জন। মুসলিম সমাজে আমরা বিতরণ করতে চাই উপকারী ইল্‌ম। যেই ইল্‌ম জীবনে উপকারে আসে না, তা থেকে আমাদের মহানবী আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আমরাও সেই ইল্‌ম বিতরণ করতে চাই না।

হুদহুদ পাখি সুলাইমান আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে অমুসলিমের দুয়ারে তাওহীদের বার্তা পৌছে দিত। মুসাফির কাফেলাকে দিত মিষ্টি পানির সন্ধান। হুদহুদ প্রকাশনও আল্লাহভোলা লোকদের কাছে তাওহীদের বাণী পৌছে দিতে চায়। জ্ঞানপিপাসায় কাতর সমাজকে দিতে চায় অমীয় সুধার সন্ধান।

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক স্বপ্ন আছে হুদহুদ প্রকাশনের; কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য পাঠকবন্ধুদের বলিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। আমরা প্রস্তুত; আপনি প্রস্তুত আছেন?

যদি আপনার প্রাইভেট কারে, সন্তানের পড়ার টেবিলে, আপনার বালিশের পাশে, অফিসের বুকসেল্ফে, আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবকে প্রদেয় গিফ্‌টের তালিকায়, আপনার ভ্রমণের ব্রিফকেসে হুদহুদ প্রকাশনের বই-পুস্তক জায়গা পায়, আর সুযোগ পেলেই যদি তাতে চোখ বোলানো হয়, তা হলে আমরা মনে করব আপনি বন্ধুত্বের তালিকায় হুদহুদকে জায়গা দিয়েছেন। হুদহুদ আপনার আপনজন।

যদি আমাদের কোন বই পড়ে আপনি পুলকিত হন; যদি আপনার হৃদয়ের মণিকোঠায় একটু সাড়া জাগে, তা হলে আপনার মোবাইলের মেসেজ অপশনে যান, অথবা খুলে ফেলুন আপনার ই-মেইল আইডি। লিখে ফেলুন ছোট্ট একটি মেসেজ। বাংলা, আরবী, ইংরেজি অথবা উর্দুতে। তারপর সেন্ড করুন আমাদের ঠিকানায়। পক্ষান্তরে যদি আমাদের কোন বই পড়ে আপনি রুষ্ট হন, আপনার চোখে ধরা পড়ে আমাদের কোন ত্রুটি, তা হলেও আপনার পরামর্শ লিখে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন। আমরা খুশি হব; আপনার জন্য দোআ করব এবং শুধরে যাব।

আমরা আপনার সাথে এমন বন্ধুত্ব কায়েম করতে চাই, যার উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি। যার প্রতিদান বিচারের দিনে আরশের নীচে ছায়া প্রাপ্তি। হাদীস শরীফে আছে– যদি দু'জন লোক একে অপরকে ভালোবাসে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; এই লক্ষেই তারা (মাঝে মাঝে) মিলিত হয় এবং এই লক্ষেই বিচ্ছিন্ন হয়, তা হলে তারা সেই দিন আরশের ছায়ায় জায়গা পাবে, যে দিন উক্ত ছায়া বাদে আর কোন ছায়া থাকবে না।

আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম
মহাপরিচালক
হুদহুদ প্রকাশন

পুণ্যের দূত

যখন আমার প্রথম ছেলে জন্মগ্রহণ করে, তখন আমার বয়স ত্রিশ ছুঁই ছুঁই। সেই রাতের কথা কখনও ভুলতে পারি না। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত বন্ধুদের এক আড্ডায় গল্পে মত্ত ছিলাম। গল্প মানে অনর্থক যত বিষয়– গীবত, শেকায়েত, পরনিন্দা, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদি। হাসি ছিল মাত্রা ছাড়ানো। আর আমার দুষ্টুমি ছিল সবার উপরে। কারও আচরণ নকল করার বিদ্যা যেকেউ আমার কাছ থেকে শিখতে পারে। কারও আচরণ বা কথাবার্তা অবিকল নকল করতে আমার সময় লাগে কয়েক মুহূর্ত। এতে আমার বন্ধুরা খুব মজা পায়। আমি যেকারও কণ্ঠ নকল করতে পারতাম। আর আমার এই অপকর্ম থেকে রক্ষা পেয়েছে, এমন কোন বন্ধু হয়তো নেই।

সেই রাতে নতুন দুষ্টুমি আমার মাথায় চেপেছিল। সন্ধ্যায় বাজার হয়ে কোথাও যাচ্ছিলাম। ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করছিল এক অন্ধ লোক। আমি তার সামনে পা বাড়িয়ে দিলাম। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল সে। আমার দিকে ফিরে বেচারা অনেক বকাবকি করল। অনেক কিছু বলতে বলতে সামনে এগিয়ে গেল। এদিকে আমি এই আচরণের জন্য লজ্জিত হওয়ার বদলে খিলখিলিয়ে হাসছিলাম।

শেষ রাতের দিকে আমি বাসায় ফিরলাম। স্ত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তখন আমাকে তার প্রয়োজন ছিল সীমাহীন। জরুরীভিত্তিতে হাসপাতালে যাওয়ার দরকার ছিল। আমাকে দেখে তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, রাশেদ! কোথায় ছিলে?
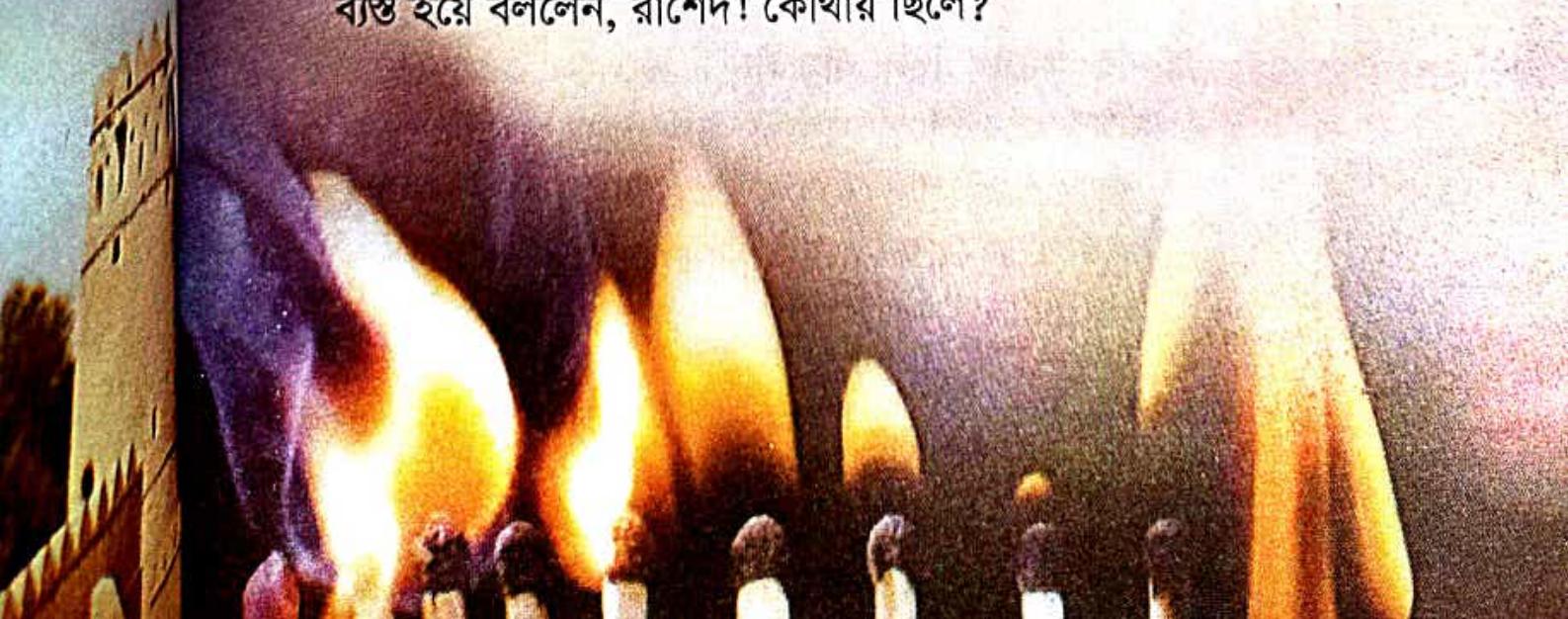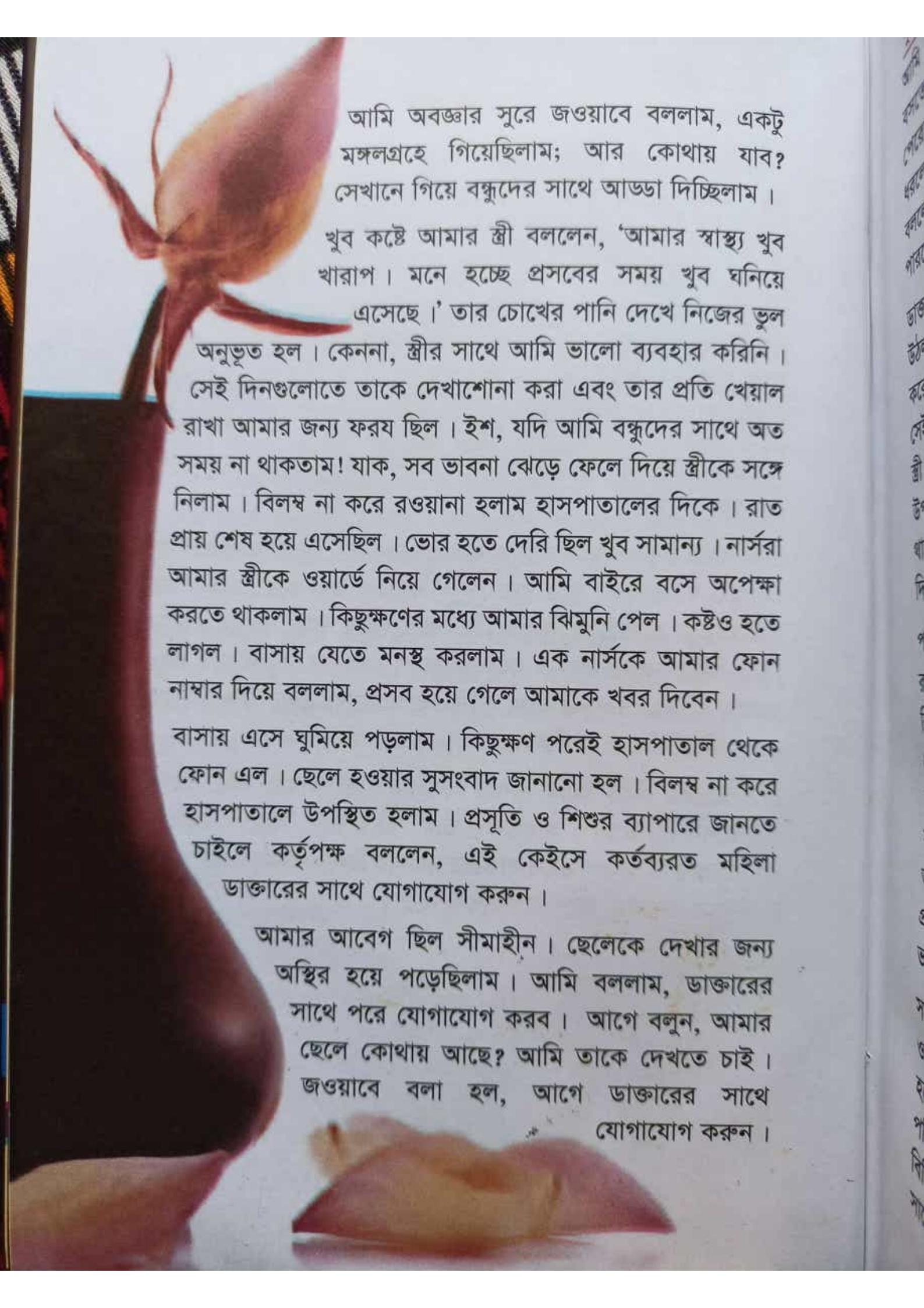
আমি অবজ্ঞার সুরে জওয়াবে বললাম, একটু মঙ্গলগ্রহে গিয়েছিলাম; আর কোথায় যাব? সেখানে গিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলাম।

খুব কষ্টে আমার স্ত্রী বললেন, 'আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ। মনে হচ্ছে প্রসবের সময় খুব ঘনিয়ে এসেছে।' তার চোখের পানি দেখে নিজের ভুল অনুভূত হল। কেননা, স্ত্রীর সাথে আমি ভালো ব্যবহার করিনি। সেই দিনগুলোতে তাকে দেখাশোনা করা এবং তার প্রতি খেয়াল রাখা আমার জন্য ফরয ছিল। ইশ, যদি আমি বন্ধুদের সাথে অত সময় না থাকতাম! যাক, সব ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিলাম। বিলম্ব না করে রওয়ানা হলাম হাসপাতালের দিকে। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ভোর হতে দেরি ছিল খুব সামান্য। নার্সরা আমার স্ত্রীকে ওয়ার্ডে নিয়ে গেলেন। আমি বাইরে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার ঝিমুনি পেল। কষ্টও হতে লাগল। বাসায় যেতে মনস্থ করলাম। এক নার্সকে আমার ফোন নাম্বার দিয়ে বললাম, প্রসব হয়ে গেলে আমাকে খবর দিবেন।

বাসায় এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরেই হাসপাতাল থেকে ফোন এল। ছেলে হওয়ার সুসংবাদ জানানো হল। বিলম্ব না করে হাসপাতালে উপস্থিত হলাম। প্রসূতি ও শিশুর ব্যাপারে জানতে চাইলে কর্তৃপক্ষ বললেন, এই কেইসে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমার আবেগ ছিল সীমাহীন। ছেলেকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। আমি বললাম, ডাক্তারের সাথে পরে যোগাযোগ করব। আগে বলুন, আমার ছেলে কোথায় আছে? আমি তাকে দেখতে চাই। জওয়াবে বলা হল, আগে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আমি ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি আমাকে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। এরপর দীর্ঘ ভূমিকা পেশ করলেন। বালা-মসিবত ও পেরেশানীর উল্লেখ করে তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার ফযীলত তুলে ধরলেন। তারপর আচানক তিনি ভয়ঙ্কর একটি সংবাদ দিলেন। বললেন, বাচ্চার চোখে সমস্যা আছে। মনে হচ্ছে সে কখনও দেখতে পারবে না; অন্ধ হবে।

ডাক্তারের কথা শুনে আমার মাথা নত হয়ে এল। চোখের সামনে ভেসে উঠল গত সন্ধ্যার সেই অন্ধ লোকটির ছবি, যার সাথে আমি ঠাট্টা করেছিলাম। আমার কিছু বলার ছিল না। ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই কক্ষ ত্যাগ করলাম। এগিয়ে গেলাম প্রসূতিকক্ষের দিকে। আমার স্ত্রী হলেন সবর ও শুকরের জীবন্ত প্রতীক। তিনি আমাকে শতসহস্র বার উপদেশ দিতেন, কারও সাথে ঠাট্টা কোরো না; গীবত থেকে বিরত থাকো। পরের নিন্দা কোরো না। কিন্তু আমি তার উপদেশ এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতাম।

পরের দিন আমরা হাসপাতাল থেকে বাসায় এলাম। ছেলের নাম রাখলাম সালেম। আমার কল্পনার আরশিতে স্ত্রীর উপদেশগুলো কিছুক্ষণ ঝলমল করে আবার নিভে গেল। সত্য বলতে কি, সালেমের প্রতি আমার কোন ভালোবাসা ছিল না। আমি তার দিকে কখনও মনোযোগ দিতাম না। মনে করতাম, বাসায় সালেম নামে কেউ নেই। যখন সে কাঁদত, তখন আমি উঠে অন্য কামরায় চলে যেতাম। কিন্তু আমার স্ত্রী ওকে ভীষণ ভালোবাসতেন। খুব যত্ন করতেন। সালেমের প্রতি আমার কোন ঘৃণাবোধ ছিল না বটে; তবে ওর প্রতি আমার কোন ভালোবাসা ছিল না।

সময়ের সাথে সাথে সালেম বড় হতে থাকল। হামাগুড়ি দেওয়া শিখল। ওর হামাগুড়ি অন্য শিশুদের থেকে ভিন্ন ছিল। যখন ওর বয়স একবছর হয়ে গেল, তখন আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল ও। ওর হাঁটা থেকে পরিষ্কার হতে লাগল যে, পায়ে খানিকটা ল্যাংড়ামিও আছে। সালেমের বিভিন্ন প্রতিবন্দ্বিতা আমার মস্তিষ্কের বোঝা আরও বাড়িয়ে দিল। সালেমের পর আমার ঔরসে আরও দুটি সন্তান হল– ওমর ও খালেদ।

সময়ের গতি কত দ্রুত, সেটা অনুমানই করা যায় না। চলে গেল কয়েক বছর। আমার ছেলেরা সব বড় হয়ে গেল; কিন্তু আমার দিবানিশিতে কোন পরিবর্তন এল না। আমি ঘরে বসিই না; সবসময় বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মত্ত থাকি। আড্ডার মূল আকর্ষণ আমি। একজন জোকার, যে বন্ধুদেরকে সবসময় হাসি-আনন্দে মাতিয়ে রাখে।

আমার শত-সহস্র অন্যায় সত্ত্বেও একটি সত্তা ছিল, যে আমার ব্যাপারেও নিরাশ ছিল না। আমার কল্যাণ কামনা করে তার দোআ ছিল অব্যাহত। আপনাকে বলব, সেই সত্তা কে? আমার বাচ্চাদের মা। আমার স্ত্রী সারা রাত আমার জন্য অপেক্ষা করতেন। আমি সালেম বাদে অন্য বাচ্চাদের অনেক ভালোবাসতাম। সালেমের সাথে সম্পর্ক ছিল দায়ঠেকা গোছের। সত্য বললে সেই সম্পর্ক না থাকার মতই। এই একটি বিষয়েই আমার স্ত্রী অনেক কষ্ট পেত। সালেম ও তার এক ভাই স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত হল। তবুও সময় সম্পর্কে আমার অনুভূতি জাগল না। আমার কাজ অফিসে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া করা, আর রাতভর বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া।

এক জুমাবারের কথা। নিয়মের খেলাফ, সে দিন এগারোটা বাজে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। এক ওলীমার অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল। এজন্য নতুন কাপড় পরিধান করে আতর লাগালাম। এরপর বাসা থেকে বের হতে লাগলাম। কামরা থেকে বের হয়ে দেখি সালেম যারযার হয়ে কাঁদছে। আমার পা থেমে গেল।

জীবনে এই প্রথম সালেমের কান্না দেখে আমি থেমে গেলাম। দশ বছর গত হয়ে গেছে, কখনও আমি তার দিকে ভালো করে তাকাইনি। একটু আদরও করিনি। আজও ইচ্ছা ছিল যে, ওকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে যাব। ও ওর মাকে ডাকছিল। জানি না, কী জযবা আর আবেগের কারণে তার দিকে ফিরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, সালেম! কাঁদছ কেন?

আমার কথা শুনে ও কান্না বন্ধ করল। যখন ও বুঝতে পারল যে, আমি আশপাশে কোথাও আছি, তখন খুব কাছে রয়েছি কি না, তা উপলব্ধি করার জন্য ডানে বামে হাত নাড়তে লাগল।

যখন ও বুঝতে পারল যে, আমি খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছি, তখন ও একদিকে সরে যেতে লাগল। আমি আরও নিকটবর্তী হতে চাইলাম ওর। কিন্তু ও দূরে চলে গেল। কেমন যেন ও আমাকে আগের সমস্ত আচার-ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছিল, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? দশ বছর পর আমার কথা মনে পড়ল?

আমি ওর পিছু নিলাম। ও নিজের কামরায় চলে গেল। আমিও ওর পিছনে পিছনে গেলাম। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, সালেম! বাবা, কাঁদছিলে কেন? কিন্তু ও আমাকে কান্নার কারণ জানাতে অস্বীকার করল। আমি আরও কাছাকাছি হলাম ওর। তারপর ওর কোমল হাত ধরে আদর করে জিজ্ঞেস করলাম, বেটা! কাঁদছিলে কেন?

আমার পীড়াপীড়িতে কান্নার কারণ বলতে লাগল সালেম। আমি যতই ওর কথা শুনছিলাম, ততই আমার দিলের অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছিল। আমার কণ্ঠ বন্ধ হয়ে গেল। শ্বাস দ্রুত পড়তে লাগল। সালেমের কান্নার কারণ কী ছিল, বলব আপনাকে?

আজ ওর ভাই ওমর ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে ওকে সময়ের আগেই মসজিদে নিয়ে যেত। সেদিন ছিল জুমাবার। এজন্য তার আশঙ্কা ছিল যে, বিলম্বের কারণে হয়তো প্রথম কাতারে জায়গা পাওয়া যাবে না।

এরপর সালেম ওমরকে ডাকল; ওর মাকে ডাকল। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না। তখন ও আবার কান্না শুরু করল। আমি ওর অশ্রু দেখতে পেলাম, যা ওর দৃষ্টিহীন চোখদুটি থেকে গড়িয়ে পড়ছিল। ওর বাকি কথাগুলো আর শুনতে পারলাম না। আগে বেড়ে ওর আলোহীন চোখের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলাম, সালেম! শুধু মসজিদে যেতে দেরি হওয়ার কারণেই কি কাঁদছিলে?

ও জওয়াব দিল, জি; হাঁ।

মানুষ অত্যন্ত গাফেল ও কমজোর প্রাণী। সে কি জানে সামনের মুহূর্তে তার ভাগ্যে কী আছে? নিজের অন্ধ ছেলের সাথে কথা বলার এই সময়টুকু ছিল এমন বৈপ্লবিক যে, মুহূর্তের ব্যবধানে আমার জীবনের ধারা বদলে দিল। আমার জীবনে পরিবর্তন এল। বন্ধুদেরকে ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম আমার যে ওলীমার অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল, তা-ও।

আমি সালেমকে সম্বোধন করে বললাম, সালেম! পেরেশান হয়ো না। তুমি কি জান আজ তোমার সঙ্গে কে মসজিদে যাবে?

ও বলল, নিশ্চয়ই ওমর যাবে; কিন্তু সে তো সবসময় দেরি করে! আমি বললাম, চিন্তা কোরো না; আজ তোমার বাপ তোমাকে মসজিদে নিয়ে যাবে। আজ তোমার আঙুল ধরে আমিই যাব।

সালেম বিস্মিত হয়ে গেল। বিশ্বাস হল না ওর। ওর ধারণা হল আমি ওর সাথে মজাক করছি। কি যেন ভেবে কান্না বন্ধ করল ও।

আমি ওর চোখের পানি মুছে দিলাম। তারপর বাযু ধরে গাড়ির দিকে নিয়ে গেলাম। কিন্তু গাড়িতে চড়তে অস্বীকার করল ও। বলল, আব্বু! মসজিদ খুব কাছে। আমি পায়ে হেঁটে যেতে চাই, যাতে প্রতি কদমে কদমে সওয়াব পাওয়া যায়।

সর্বশেষ কবে মসজিদে গিয়ে ছিলাম, তা আমার মনেই পড়ে না। কিন্তু এই জীবনের প্রথম লজ্জিত হয়ে জমীনে পতিত হলাম এবং এতদিন পর্যন্ত মহান প্রভু থেকে সম্পর্কহীন থাকার কারণে অনুশোচনা অনুভূত হল। মসজিদ মুসল্লী দিয়ে ভরে গিয়েছিল। একটু চেষ্টা করে সালেমের জন্য প্রথম কাতারে জায়গা নিতে হল। আমরা জুমার খুতবা শুনলাম। তারপর দাঁড়ালাম নামাযের জন্য। সালেম আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল; বরং সত্য বললে বলতে হয়, আমিই ওর পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলাম।

নামায শেষ হলে সালেম বলল, আমাকে একটি কুরআন শরীফ এনে দিন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই ছেলে কুরআন পড়বে কীভাবে? এ তো অন্ধ। একবার ভাবছিলাম, ওর এই কথা শুনবার প্রয়োজন নেই; কিন্তু পরে চিন্তা-ভাবনা ফেলে দিয়ে কুরআনের একটি কপি নিয়ে ওর হাতে দিলাম। এবার ও বলল, সুরা কাহাফটা একটু বের করে দিন। আমি সূচিপত্র দেখে দেখে সুরা কাহাফ বের করলাম। সালেম কুরআন মাজীদ হাতে নিল। অত্যন্ত আদব ও এহতেরামের সাথে কুরআন শরীফ সামনে রেখে সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করতে লাগল সালেম। ওর চোখ ছিল নিষ্প্রভ।
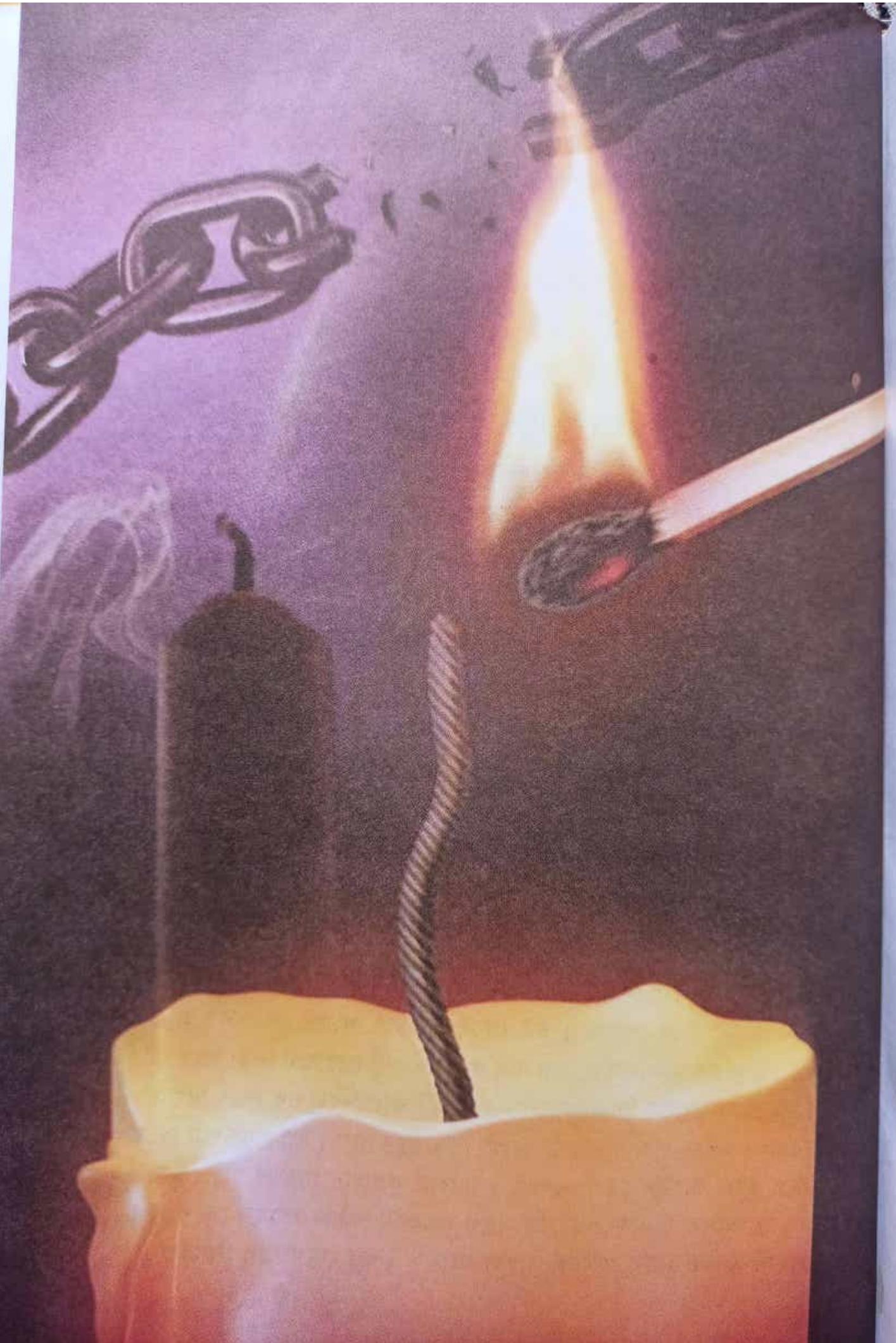
কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ণ ধীরস্থিরতার সাথে তেলাওয়াত করতে থাকল। স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যদিও ওর চোখ দীপ্তিহীন; কিন্তু পুরো সুরা ওর মুখস্থ। আমার বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে গেল।

আমার লজ্জা অনুভূত হতে থাকল। আমি কুরআনের একটি কপি হাতে নিলাম। বের করলাম সুরা কাহাফ। আমার শিরা-উপশিরায় এক প্রকার বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি কুরআন করীম পড়া শুরু করলাম। পড়তে থাকলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত পড়তে থাকলাম। যত পড়তে থাকলাম, ততই আমার চোখের উপর থেকে গাফলতের পর্দা সরে যেতে থাকল। তারপর ধরা গলায় আমার রবের কাছে হেদায়েতের দোআ করলাম। নিজেকে সামলাতে পারলাম না। অতীতের ধুলোর আবরণ দূর হয়ে গেল। স্মৃতির আয়নায় অতীতের বিভিন্ন ঘটনা ঝলমল করতে লাগল। নিজের গুনাহের কথা মনে পড়ে গেল এবং অনুতাপ এত তীব্র হল যে, আমি শিশুদের মত ফোঁপাতে লাগলাম।

কিছু কিছু মুসল্লী সুন্নত পড়ছিলেন। তাদের কারণে আমার লজ্জা অনুভূত হল। খুব চেষ্টা করলাম, যাতে আমার ফোঁপানো বন্ধ হয়। এতে আমার আওয়াজ বন্ধ হল। এখন দীর্ঘ শ্বাস পড়ছিল এবং কণ্ঠনালী থেকে হেচকি উঠছিল। আচানক একটি কোমল হাত আমার চেহারা মুছতে লাগল। আমার চোখের পানি মুছে দিল সে। এ ছিল আমার ছেলে সালেম। আমি বুকে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। দরদভরা দৃষ্টিতে তার দিকে দেখলাম আর মনে মনে বললাম, অন্ধ তুমি নও; অন্ধ আমি।

এরপর আমরা বাসায় ফিরলাম। আমার স্ত্রী সালেমের কথা ভেবে চিন্তায় নিমজ্জিত ছিল। তার জানা ছিল না যে, আজ আমি তাকে জুমা পড়ানোর জন্য নিয়ে গেছি। যখন তিনি জানতে পারলেন, আমরা বাপ-বেটা একত্রে মসজিদে গিয়েছিলাম, তখন তাঁর অস্থিরতা আনন্দে বদলে গেল। এরপর আমার জীবনে এমন বিপ্লব এল যে, সেদিন থেকে আর কখনও নামায কাযা হয়নি। আমি খারাপ সোসাইটি ছেড়ে দিলাম। এখন আমি মসজিদের নামাযীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালো ও

পরহেযগার লোকদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছি। আমি অনুভব করে ফেলেছি ঈমানের স্বাদ। নেককার বন্ধুবান্ধব থেকে দীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখেছি।

এরপর আমার অবস্থা হয়েছে এই যে, তালীমের কোন হালকা এবং কোন দীনী প্রোগ্রামে আমি কখনও অনুপস্থিত থাকি না। কুরআন করীমের তেলাওয়াত আমার আদতে পরিণত হয়েছে। মাসে অন্তত একবার কুরআন করীম খতম করি। আমার যবানে আল্লাহ তাআলার হাম্‌দ-সানা জারী থাকে। অতীতের কথা মনে পড়লে আরও বেশি করে যিকির-আযকার করি, যাতে আল্লাহ তাআলা আমার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেন। মানুষের সাথে কত কষ্টদায়ক আচার-ব্যবহার করেছি। তাদের আচরণ ও কথাবার্তা নকল করতাম। তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম। তাদের ব্যাপারে কটু মন্তব্য করতাম। তাদের মনের শীশা ভাঙতাম। আহ! কী ভয়ানক অন্ধকার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতাম আমি!

এখন আমি পরিবারের লোকদের অনেক আপন হয়ে গেছি। আমার স্ত্রীর চেহারায় এখন রওনক এসেছে। কোথায় তার সেই উদাস চেহারা, যখন তিনি আমার ব্যাপারে চিন্তিত ও বিষণ্ন থাকতেন, আর কোথায় তার বর্তমান মুচকি হাসি, আর আনন্দসিক্ত অম্লান বদন!

এরপর আমার সালেমেরও আনন্দের সীমা রইল না। ঘরে বসন্ত এল। আমার বেশিরভাগ সময় সালেমের সাথে অতিবাহিত হয়। আল্লাহ তাআলার অজস্র নেয়ামতের উপর শুকর আদায় করি।

একদিন কয়েকজন সাথী বললেন, আমরা আল্লাহর দীনের দাওয়াত নিয়ে দূরের কোন দেশে যেতে চাই। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। আমি দাওয়াত ও তাবলীগের মহান ফরয সম্পর্কে একদম বে-খবর ছিলাম। জমীনের বোঝা হয়ে বসে ছিলাম। কখনও ভুলেও মনে হয়নি যে, দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য পা বাড়ানো দরকার। একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম; কিন্তু তাদের পীড়াপীড়ি অব্যাহত। এস্তেখারা করলাম; স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলাম। তিনি তো অনেক দিন থেকে আশা করছিলেন যেন সুদৃঢ় দীনের দাঈ হয়ে যাই। আমি ভাবছিলাম, তিনি আমাকে দেশের বাইরে যেতে দিতে চাইবেন না; কিন্তু ফল বের হল সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমি তাঁর ঈমানদীপ্ত প্রতিক্রিয়ায় যারপরনাই খুশি হলাম। তিনি আমাকে সাহস দিলেন। তাঁকে না জানিয়ে পাপ আর অনাচারের উদ্দেশ্যে কত দেশে যেতাম; অথচ এখন যাচ্ছি ইসলামের পয়গাম প্রচারের জন্য। এখন তাঁর আপত্তির প্রশ্ন আসে কোত্থেকে?

আমি সালেমের সাথে কথা বললাম। সফরের উদ্দেশ্য খুলে বললাম ওকে। ও ওর ছোট দুটি হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। বলল, আব্বু! দাওয়াত ও তাবলীগ প্রত্যেক মুসলমানের যিম্মাদারী। আপনি দাওয়াতের কাজে বিলম্ব না করে চলে যান।
অবশেষে আমি তাবলীগী সফরে বের হয়ে পড়লাম।

ঘর থেকে বের হওয়ার পর তিন মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে বেশ কয়েক বার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেছি। কিন্তু কেন যেন সালেমের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়ে উঠল না। যখনই কথা বলতাম, তখনই সে হয়তো স্কুল অথবা মসজিদে গিয়ে থাকত, অথবা ঘুমিয়ে থাকত। তার কণ্ঠ শোনার তামান্না ছিল অপরিসীম। অন্য বাচ্চাদের সাথে কথা হয়েছিল; কিন্তু সালেমের কথা শোনার সুযোগ হল।

যখনই স্ত্রীকে ফোন করতাম, তখনই তিনি আমাকে সালেমের কথাবার্তা শোনাতেন। তারপর একদিন আমরা দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম। স্ত্রীকে ফোন করে বললাম, আমরা ফিরে আসছি। বাচ্চারা কেমন আছে? সালেম কেমন আছে? আজ তাঁর কণ্ঠ অন্য রকম শোনাল। যে অদম্য আগ্রহ আর উদ্দীপনা নিয়ে তিনি কথা বলতেন, আজ কণ্ঠে সেটা পাওয়া গেল না। আমি তাঁকে বললাম, সালেমকে সালাম বলবে এবং ওকে জানাবে যে, আমি ফিরে আসছি। স্ত্রী ইনশা আল্লাহ বলে নীরব হয়ে গেলেন এবং ফোন বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরে ফিরে এলাম। দরজায় নক করলাম। কল্পনার জানালা দিয়ে দেখছিলাম যে, সবার আগে সালেম এগিয়ে আসছে এবং আমাকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে। দরজাও সে-ই খুলছে। কিন্তু তাজ্জব হলাম, সালেমের বদলে আমার চার বছর বয়সী ছেলে খালেদ বাবা বাবা বলতে বলতে হাত ধরে ঝুলে পড়ল।
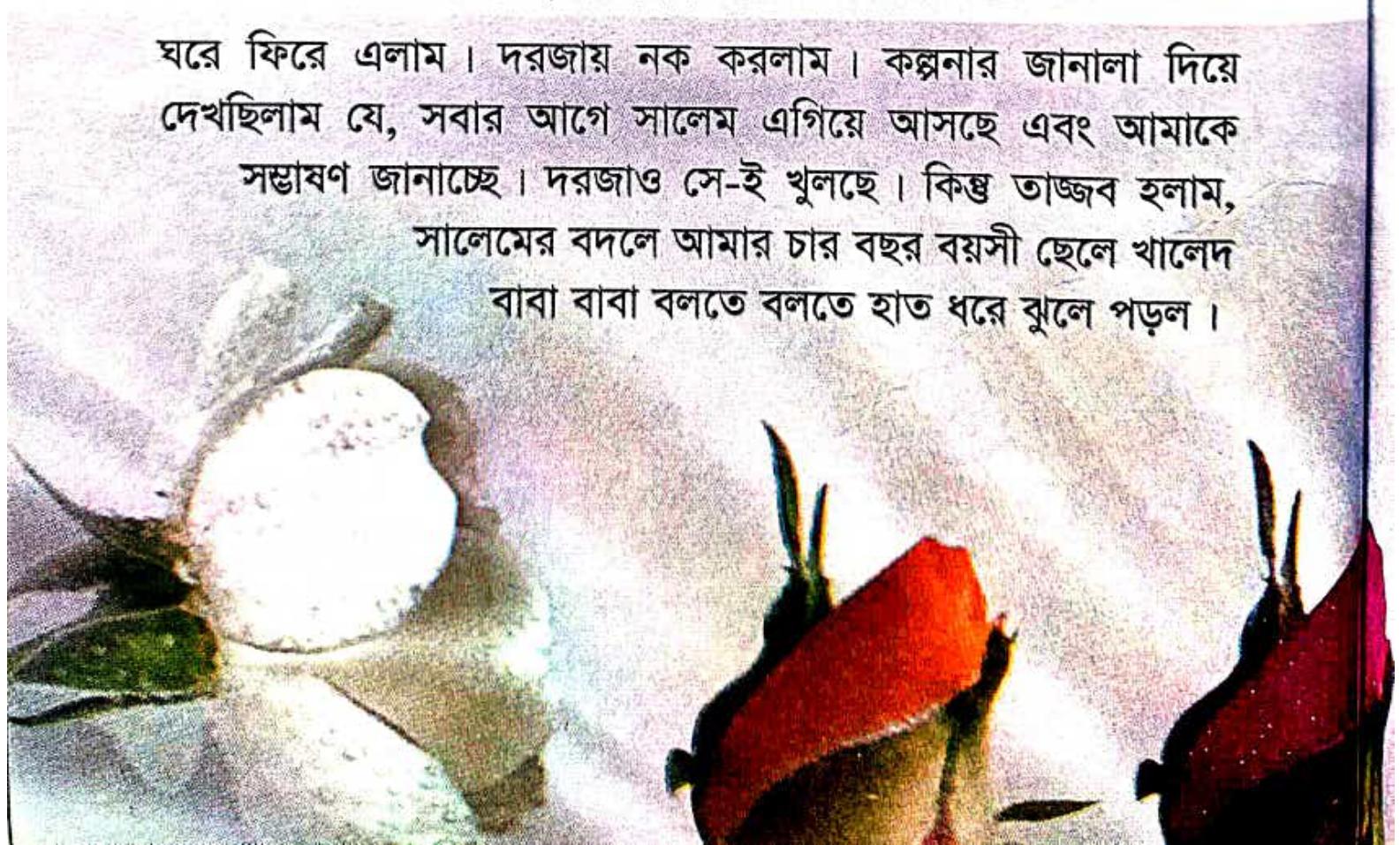
সেদিন কেন যেন বুকের ভিতরে ব্যথা অনুভূত হচ্ছিল। আমি 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রজীম' পড়ে ঘরে প্রবেশ করলাম। সম্ভাষণ জানানোর জন্য এগিয়ে এলেন আমার স্ত্রী। তাঁর চেহারা মলিন দেখাল। সবসময় যেই ঠোঁটে মুচকি হাসি লেগেই থাকে, তাতে আজ কৃত্রিমতার স্বচ্ছ আভাস। আমি বললাম, সবাই ভালো আছ? আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে?

তিনি বললেন, না; কিছু তো হয়নি।

এরপর আচানক আমার সালেমের কথা মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, সালেম কোথায়?

স্ত্রী মাথানত করলেন। কোন জওয়াব দিলেন না। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা বয়ে যেতে লাগল। আমি চিৎকার দিলাম, সালেম... সালেম কোথায়? আমার ছেলে খালেদ এগিয়ে এসে তো তো করে বলল, বাবা! ভাইয়া জান্নাতে চলে গেছে; আল্লাহ তাআলার কাছে।

আমার স্ত্রীর ধৈর্যের পাত্র উথলে উঠল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি। মনে হল জমীনে পড়ে যাবেন তিনি। সুতরাং আমি কামরা থেকে বের হয়ে এলাম। নিজকে সামলাতে পারলাম না। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলাম।

পরে জানতে পারলাম, আমার ফিরে আসার তারিখ থেকে পনেরো দিন আগে সালেমের জ্বর হয়েছিল। আমার স্ত্রী ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু যত চিকিৎসা চলতে থাকে, ততই ওর জ্বর বাড়তে থাকে। একদিন ওর পবিত্র আত্মা রক্ত-মাংসের খাঁচা ছেড়ে আসমানে উড়ে যায়।
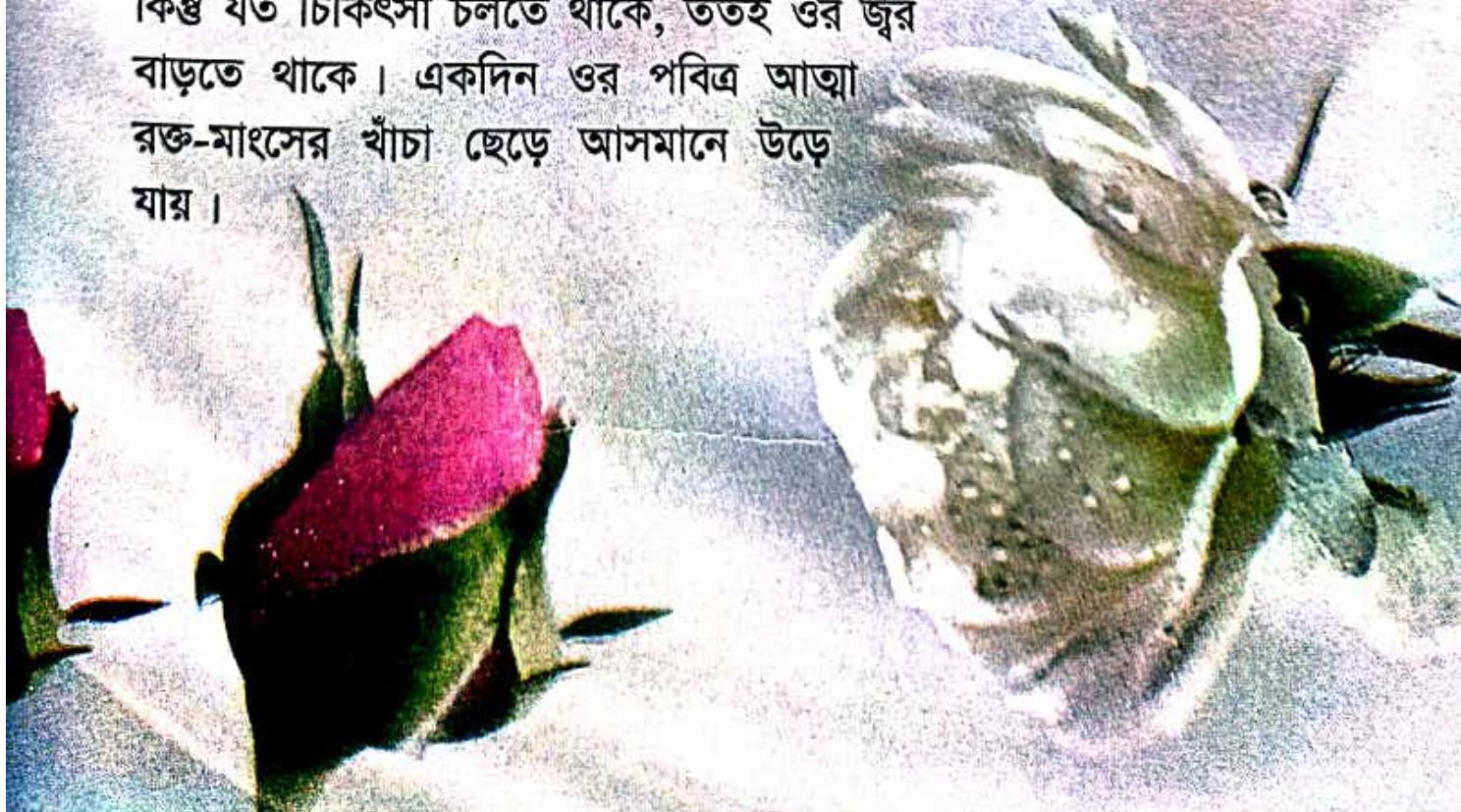
সত্য বর্জনের পরিণাম

অনেক সময় কোন কোন ব্যক্তির দিল হেদায়েত গ্রহণ করতে চায়; কিন্তু দীনের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা থেকে অহংকার তাদেরকে ফিরিয়ে রাখে।

হাঁ, তারা লুঙ্গি, পায়জামা, পাতলুন ইত্যাদি গোড়ালির উপরে তুলে পরিধান করতে সংকোচ বোধ করে। আবার দাড়ি লম্বা করে মুশরিকদের বিরোধিতা করতেও তাদের পছন্দ হয় না। তাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য রক্ষা করা সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মান্য করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক নারীর অবস্থাও অভিন্ন। অলঙ্কার আর অঙ্গসৌষ্ঠব প্রকাশ করার জন্য পর্দার ব্যাপারে তারা উদাসীনতা দেখায়। ভ্রু পেলাক করে, আঁট-সাঁট পোশাক পরে তারা স্রষ্টার না-ফরমানী করে। কখনও উপদেশ করা হলে, দাম্ভিকতা দেখায়, অহঙ্কার দেখায়।

যার অন্তরে বিন্দু-বিসর্গ অহঙ্কার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর এই অহঙ্কার যদি হেদায়েত গ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তা হলে কী হবে?

গাস্‌সান সম্প্রদায়ের একজন শাসকের নাম ছিল জাবালা ইবনে আইহাম। তার চোখে ঈমানের সৌন্দর্য ধরা পড়ল। তিনি ইসলাম কবুল করলেন। তারপর খলীফা ওমর ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু'র কাছে চিঠি লিখলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি আপনার সাথে দেখা করতে চাই।

ওমর ও অন্যান্য মুসলমান জাবালা আগমনের খবর শুনে যারপরনাই খুশি হলেন। ওমর তাঁকে জওয়াবী চিঠিতে লিখলেন–

আপনি আসুন। আপনার জন্য রয়েছে সেই নিরাপত্তা ও অধিকারসমূহ, যা ইসলাম আমাদেরকে দান করেছে। সাথে সাথে আপনাকে সেই আদেশ-নিষেধও পালন করতে হবে, যেগুলো ইসলাম আমাদের উপর আরোপ করেছে।

জাবালা পাঁচশত অশ্বারোহী নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মদীনার নিকটবর্তী হয়ে তিনি সোনার তার দিয়ে বুননকৃত কাপড় পরিধান করলেন। মাথায় স্থাপন করলেন মণিমুক্তাখচিত রাজকীয় মুকুট। সৈনিকদেরকেও অত্যন্ত মূল্যবান পোশাক পরালেন।

এরপর যখন তিনি মদীনায় প্রবেশ করলেন, তখন লোকজন তাকে দেখার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। এমন কি নারী-শিশুরাও বাকি থাকল না। একসময় তিনি ওমরের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং খুব কাছে বসালেন।

দেখতে দেখতে হজের মৌসুম চলে এল। ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। তাঁর সাথে সঙ্গী হলেন জাবালা।

একদিন তিনি বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছিলেন। আচানক বনী ফাযারা'র এক দরিদ্র ব্যক্তি তার লুঙ্গির প্রান্তে পাড়া দিয়ে বসল। তার দিকে তাকালেন জাবালা। তিনি তখন রাগে অগ্নিশর্মা। দরিদ্র লোকটিকে খুব জোরে থাপ্পড় মারলেন তিনি। এতে বেচারার নাক ভেঙে গেল।

ফাযারী ব্যক্তিও ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ওমর ইবনে খাত্তাবের কাছে অভিযোগ করল সে। ওমর জাবালাকে ডেকে আনলেন।

বললেন, কী ব্যাপার জাবালা! তাওয়াফ করতে গিয়ে আপনি এক মুসলমান ভাইকে থাপ্পড় মেরে তার নাক ভেঙে দিয়েছেন কেন?

জাবালা অত্যন্ত দম্ভ ও অহঙ্কার নিয়ে বললেন, ও আমার লুঙ্গিতে পাড়া দিয়েছে। যদি বাইতুল্লাহর হুরমতের মাসআলা না থাকত, তা হলে আমি ঘাড় মটকে দিতাম।

ওমর বললেন, আপনি অপরাধ স্বীকার করেছেন। সুতরাং মুসলমান ভাইকে সন্তুষ্ট করুন, না হয় আমি আপনার কাছ থেকে বদলা গ্রহণ করব এবং সে আপনার চেহারায় সেভাবেই থাপ্পড় মারবে, যেভাবে আপনি তার চেহারায় মেরেছেন।

জাবালা বললেন, আমার কাছ থেকে বদলা নেওয়া হবে, অথচ আমি একজন সম্রাট, আর সে একজন ইতর!

ওমর বললেন, জাবালা! ইসলাম আপনাকে ও তাকে সমান করে দিয়েছে। সুতরাং তাকওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ে আপনি তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারবেন না।

জাবালা বললেন, তা হলে আমি আবার নাসারা হয়ে যাব।

ওমর বললেন, ইসলামের হুকুম, যে তার ধর্ম পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা করে ফেলো। যদি আপনি নাসারা হয়ে যান, তা হলে আমি আপনার গর্দান উড়িয়ে দিব।

জাবালা বললেন, আমীরুল মুমিনীন! ভাববার জন্য আপনি আমাকে আগামী কাল পর্যন্ত সময় দিন।

ওমর বললেন, তোমাকে তা দেওয়া হল।

এরপর যখন রাত নেমে এল এবং লোকজন সব ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল, তখন জাবালা সাথিসঙ্গী নিয়ে মক্কা ত্যাগ করলেন এবং কুস্তন্‌তুনিয়ায় চলে গেলেন। তারপর আবার খ্রিস্টান হয়ে গেলেন।

কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর জাবালার জীবনের জ্যোতি হারিয়ে গেল। ঈমানের স্বাদ পেয়ে যে তরতাজা অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল, তা হাওয়ায় মিলে গেল। শেষ হয়ে গেল নামাযরোযার মাধ্যমে প্রাপ্ত মজা। মৃত্যু হল জীবনের। দুঃখ, বেদনার কালো ছায়া তার দিলদেমাগ আচ্ছন্ন করে ফেলল। ইসলামী যামানার সুন্দর ও আকর্ষণীয় স্মৃতিগুলো তাকে দংশন করতে থাকল। ইসলাম ছেড়ে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হওয়ায় খুব লজ্জিত হলেন তিনি। কেঁদে কেঁদে তিনি নীচের পংক্তিমালা আবৃত্তি করতে লাগলেন–

تَنَصَّرَتِ الأَشْـرافُ مِن عَارِ لَطمَةٍ
وَمَا كَانَ فِيْهَا لَو صَبرْتُ لَهَا ضَرَرْ

ভদ্র লোক একটি থাপ্পড়ের লজ্জায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করল; অথচ ধৈর্য ধারণ করলে, তার কোন ক্ষতি ছিল না।

تَكَنَّـــفَنِي فِيْهَا لَجَـــاجٌ ونَخْوةٌ
وَبِعْتُ بِهَا الْعَـيْنَ الصَّحِيْحَة بالعَوَرْ

আমাকে বেষ্টন করে ফেলল একগুয়েমি ও জিদ। সে জন্য আমি সুস্থ চোখের বিনিময়ে কিনে নিলাম অন্ধত্ব।

فَيَا لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِــدْنِي وَلَيْــتَنِي
رَجَعْتُ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِيْ قَالَ لِي عُمَرْ

হায়! যদি আমার মা আমাকে জন্ম না দিতেন! হায়রে, যদি সে কথা মেনে নিতাম, ওমর যা আমাকে বলেছিলেন!

وَيَا لَيْــتَنِي أَرْعَى الْمَخَــاضَ بِقَفْرَةٍ
وَكُنْتُ أَسِيْــرًا فِي رَبِيْـــعَةَ أَوْ مُضَــر

ইস, যদি জঙ্গল-বিয়াবানে উট চরাতাম এবং রবীআ আর মুযার গোত্রে বন্দী থাকতাম।

وَيَا لَيْتَ لِي بِالشَّــأْمِ أَدْنَى مَعِيْشَةٍ
أُجَالِسُ قَوْمِي ذَاهِبَ السَّمْعِ والبَصَرْ

আহ, যদি শামে আমার জন্য দিন গুজরানের সামান্য ব্যবস্থা থাকত এবং আমি নিজ সম্প্রদায়ে অন্ধ ও বধির হয়ে বসে থাকতাম!
এর পর মৃত্যু পর্যন্ত খ্রিস্টধর্মে অবিচল থাকলেন। হাঁ, কুফরের উপর তার মৃত্যু হল। কেননা, তিনি আল্লাহর শরীয়তের সামনে মাথানত না করে অহঙ্কার প্রদর্শন করেছিলেন।
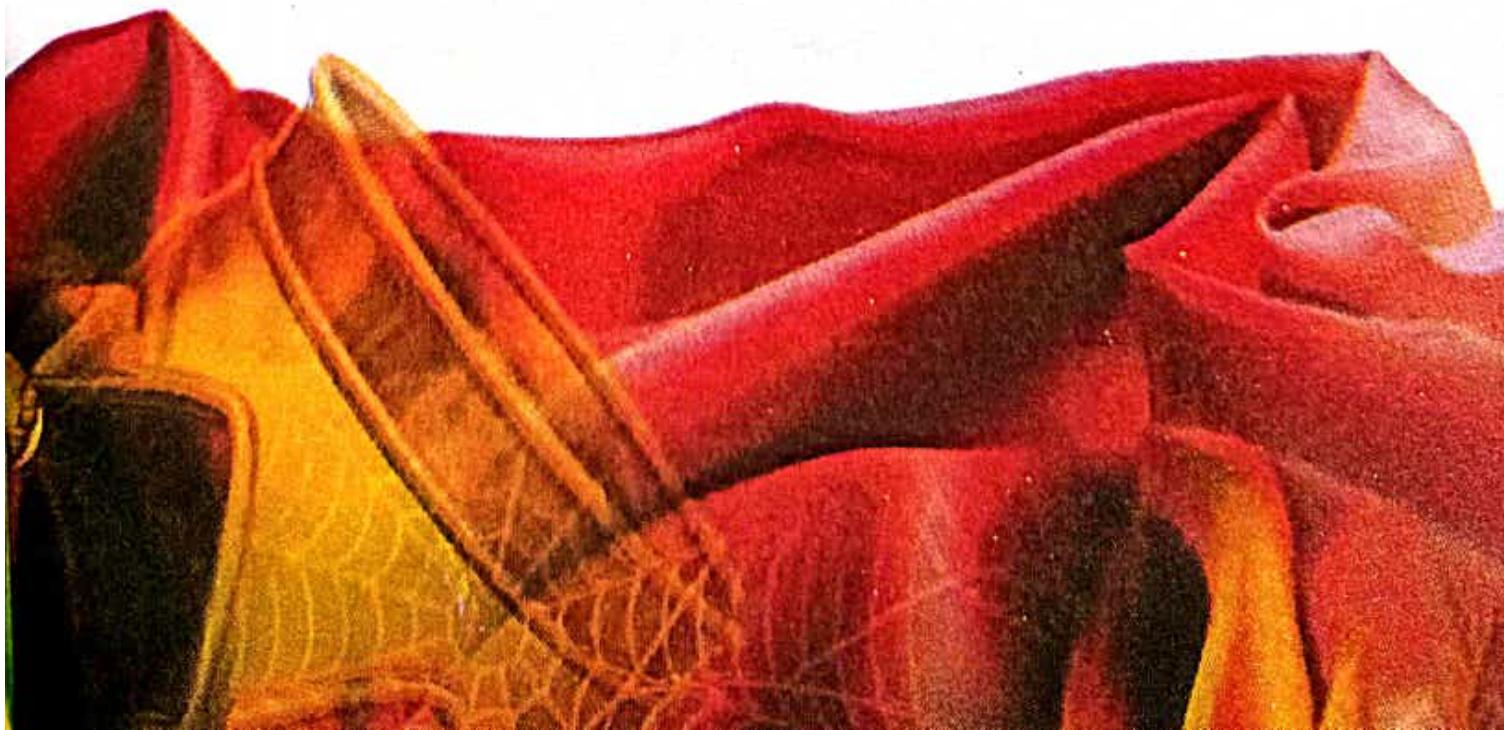
নাচঘরে মসজিদের ইমাম

একজন বুড়ো আলেম ছিলেন। এক মহল্লার মসজিদে ইমামের দায়িত্ব পালন করতেন। নামায ও কুরআন তালীমের পিছনেই জীবনের সময় ব্যয় করেছিলেন তিনি। একদিন তিনি অনুভব করলেন, দিনদিন নামাযীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বিষয়টি তাঁকে পেরেশান করছিল। মুসল্লীদেরকে তিনি নিজের সন্তানের মত ভালোবাসতেন। একদিন নামায শেষে মুসল্লীদের দিকে ফিরে বললেন, ব্যাপার কী, মানুষ নামাযে আসে না যে? বিশেষত মসজিদে যুবকদের দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না।

মুসল্লীরা বললেন, লোকজন রং-তামাশা ও উন্মাদনায় ব্যস্ত। নাচঘরে গিয়ে সবাই নাচ দেখছে। ইমাম সাহেব বললেন, নাচঘর! তা আবার কী জিনিস?

এক যুবক মুসল্লী বললেন, অনেক বড় একটি কামরা। তার একপাশে কাঠের তৈরী লম্বা-চওড়া মঞ্চ। তাতে তরুণীরা খুব সংক্ষিপ্ত কাপড়চোপড় পরে কুদাকুদি করে; বেসামাল হয়ে নাচে। লোকজন তাদের সামনে বসে তৃষ্ণকাতর দৃষ্টিতে সেই নাচ দেখে, তালি বাজায় এবং নর্তকীদের ভূয়ষী প্রশংসা করে।

বুযুর্গ ইমাম বললেন, নাউযু বিল্লাহ! আচ্ছা, এই নর্তকীদের নাচ যারা দেখে, তারা কি মুসলমান?

বৃদ্ধ ইমাম অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ন হয়ে বললেন, 'লা হাওলা, ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। এ তো মারাত্মক ঘৃণ্য পরিস্থিতি। আমাদের কর্তব্য এসব লোককে হেকমতের সাথে নসীহত করা এবং সিরাতে মুস্তাকীমে তোলার জন্য চেষ্টা করা।

ইমামের কথা শুনে মুসল্লীরা হয়রান হয়ে গেলেন। তারা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি নাচঘরে গিয়ে লোকজনকে নসীহত করবেন?
বৃদ্ধ ইমাম 'হাঁ, করব' বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, আপনারা চলুন আমার সাথে। আমরা নাচঘরে যাব।

মুসল্লীরা তাঁকে এই সিদ্ধান্ত থেকে ফেরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। তারা বললেন, জনাব! আপনি নাচঘরে যাবেন না। ওটা হচ্ছে পাপের কারখানা। ওখানে যারা থাকে, তারা মানুষ নয়; হিংস্র প্রাণী; শয়তানের চেলা। বদতমীযরা আপনাকে নিয়ে হাসি-মজাক করবে; ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। আপনাকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিবে। নানা ধরণের মন্তব্য করবে। গালাগালির তীর নিক্ষেপ করবে। আপনি ওদের হাসির পাত্রে পরিণত হবেন।

বুড়ো ইমাম ভারী গলায় বললেন, প্রিয় মুসল্লী ভাইয়েরা! চিন্তা করে বলুন তো, আমরা কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তিনি কি হকের দাওয়াত দিতে গিয়ে পরীক্ষায় পড়েননি? তাঁকে নিয়ে মজাক করা হয়নি? তাঁকে কি যাদুগর ও পাগল বলা হয়নি? কী বলেন, তাঁর রাস্তায় কি কাঁটা বিছানো হয়নি? জুলুম-অত্যাচারের এমন কোন্ পদ্ধতি আছে, যা মানবকুলের এই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তার উপর প্রয়োগ করা হয়নি? এরপর আমি আপনি কি?

ইমাম সাহেব এক মুসল্লীর হাত ধরে বললেন, নাচঘর কোন্ দিকে, আমাকে দেখিয়ে দিন। একথা বলে তিনি অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে রওয়ানা হলেন। দুই-একজন মুসল্লী তাঁর সঙ্গী হলেন।

নাচঘরের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেন তাঁরা। নাচঘরের মালিক দূর থেকেই তাদেরকে দেখে ফেলল। সে ভাবছিল, হয়তো ইমাম সাহেব কোন ওয়াজ-মাহফিলে যাবেন। কিন্তু ইমাম সাহেব সঙ্গীদের নিয়ে সোজা তার কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

নাচঘরের মালিক তাজ্জব হয়ে গেল। বলল, আপনারা কী চান, বলুন তো!

ইমাম সাহেব বললেন, 'নাচঘরে উপস্থিত লোকদেরকে ওয়াজ করতে চাই।' একথা শুনে হলমালিকের বিস্ময়ের সীমা থাকল না। ইমামের আবেদন রক্ষার অপারগতা প্রকাশ করল সে। বৃদ্ধ ইমাম খুব নরম ভাষায় তার সাথে কথা বললেন। আখেরাতে বড় প্রতিদান লাভের সুসংবাদ দিলেন। কিন্তু সে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করল। তখন ইমাম সাহেব বললেন, বুঝতে পেরেছি, আপনার ব্যবসায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে বলে, আপনি রাজি হচ্ছেন না। আচ্ছা, আমরা আপনাকে একদিনের পুরো অর্থ পরিশোধ করে দিচ্ছি।

এরপর ইমাম সাহেব একদিনের আয় হিসেব করে হলমালিককে দিয়ে দিলেন। তখন মালিক বলল, আচ্ছা, আগামী কাল প্রদর্শনী শুরু হলে আসবেন।

পরের দিন যথাসময়ে প্রদর্শনী শুরু হল। লোকজন পূর্ণ মনোযোগের সাথে নাচ দেখায় মত্ত। থিয়েটারের মঞ্চ থেকে শয়তানের আওয়াজ ভেসে আসছিল। সমস্ত দর্শকের দিল ছিল তখন শয়তানের হাতে। লোকজন তালি বাজাচ্ছিল। এমন সময় একবার পর্দা পড়ে গেল। আবার যখন পর্দা উঠল, তখন দর্শকরা সব হতভম্ব। বৃদ্ধ ইমাম গাম্ভীর্যের সাথে একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। তিনি বিসমিল্লাহ পড়লেন। আল্লাহ তাআলার হাম্‌দ-সানা বয়ান করলেন।

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় সত্তার উদ্দেশে দরুদ পড়ে ওয়াজ শুরু করলেন। দর্শকরা সব হাক্কাবাক্কা হয়ে গেল। একজন আরেক জনের দিকে দেখতে লাগল তারা। কেউ কেউ হাসিমজাক শুরু করে দিল। কিন্তু বৃদ্ধ ইমাম সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না। ওয়াজের ধারা অব্যাহত রাখলেন তিনি। অবশেষে দর্শকদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন, প্রিয় দর্শকমণ্ডলি! একটু নীরব হোন। দেখুন, ইমাম সাহেব কী বলতে চান।

তার এই কথায় পুরো হলে নীরবতা ছেয়ে গেল। দর্শকদের অন্তরে সকীনা নাযিল হতে থাকল। থেমে গেল হাসিমজাকের আওয়াজ। চারদিক ভেসে আসতে লাগল ইমাম সাহেবের আওয়াজ। তিনি খোদাভীতির এমনসব আয়াত তেলাওয়াত করতে লাগলেন, যেগুলো পাহাড়ে কম্পন সৃষ্টি করতে পারে। এরপর তিনি মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু হাদীস উল্লেখ করলেন। ঈমান ও আমালে সালেহ'র বরকত ও প্রতিদান তুলে ধরলেন। নেককারদের উচ্চ মর্যাদার বিবরণ দিলেন। আল্লাহর না-ফরমান, শয়তান ও বদকারদের ভয়ানক পরিণতির চিত্র আঁকলেন।

শিক্ষাপ্রদ অনেক কাহিনী উল্লেখ করে তিনি বললেন, আমার ভাইয়েরা! তোমরা অনেক দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছ। মেহেরবান মাওলার অনেক না-ফরমানী করেছ। খাব ও গাফলতে বহু সময় চলে গেছে। এখন একটু ভাবো। নিজের অবস্থার উপর চিন্তা করো। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে একটু বলো, আল্লাহর না-ফরমানী করে তোমরা কী পেয়েছ? তোমাদের গুনাহ তোমাদের আমলনামায় লেখা হয়েছে। এখন তোমাদের গুনাহের মজা কোথায়? নিঃসন্দেহে মজা শেষ হয়ে গেছে; অথচ তোমাদের অপকর্মের ফল রয়ে গেছে। অতিসত্বর তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। সেই সময় খুবই কাছে, যখন সবকিছু ফানা হয়ে যাবে। সূর্যের আলো থাকবে না। চাঁদ-তারা উদয়-অস্তের কাহিনী থামিয়ে দিবে। বাদল হারিয়ে যাবে। ছেয়ে যাবে অন্ধকার। শুরু হবে ঘূর্ণিঝড়। জমীন কাঁপতে কাঁপতে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। পাহাড়-পর্বত তুলার আঁশের মত উড়তে থাকবে। দরিয়ার মৌজ, শয়তানের ফৌজ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। স্রোতের পানি রাস্তা ভুলে যাবে। রুক্ষ হয়ে যাবে বসন্ত। ফুল আর ফুটবে না। চারদিকে শুরু হবে মৃত্যুর নাচন।

জীবনের একটি শ্বাসও অবশিষ্ট থাকবে না। শুধু ওয়াহেদ ও কাহ্হার আল্লাহ্ থাকবেন। নিজের হাতটা একটু বুকের উপর রাখো। কখনও নিজের অন্তরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখেছ? নিজের আমলের খবর নিয়েছ। তোমাদের কি মনে আছে, অতিসত্বর তোমরা কোথায় যাবে? তোমরা দুনিয়ার আগুন বরদাশ্ত করতে পার না। অথচ জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও সত্তর গুণ অধিক শক্তিশালী। জাহান্নামের অগ্নিশিখাকে ভয় করো। সময় নষ্ট কোরো না। ওঠো! তওবা করো। অনুতাপের অশ্রু প্রবাহিত করো। রুষ্ঠ রবকে সন্তুষ্ট করো। আহ! তোমরা প্রভুর সামনে কোন্ মুখ নিয়ে উঠবে। কখনও কি চিন্তা করেছ, আল্লাহ্ তাআলার কত এহসান রয়েছে তোমাদের উপর?

তাঁর রহমত কি তোমাদের উপর হারদম নাযিল হয় না এবং তোমাদের গুনাহের বোঝা কি তাঁর কাছে উপস্থিত হয় না? তিনি তোমাদেরকে হাজারও নেয়ামত দিতে থাকেন, আর তোমরা প্রতি মুহূর্তে তাঁর না-ফরমানীতে ডুবে থাক। নিজের সীমালঙ্ঘন দেখো, তাঁর অনুকম্পাও দেখো!

বৃদ্ধ ইমাম দিলের গভীর থেকে কথা বলছিলেন। তাঁর ওয়াজ হৃদয়ে ঝঙ্কার সৃষ্টি করছিল।

প্রতিটি বাক্য তীর হয়ে দর্শকদের বুকে গাঁথছিল। তাদের দিলের কায়া বদলে গেল। জীবনের মূল হাকীকত সূর্যের মত স্পষ্ট হয়ে গেল। লোকজন কাঁদতে লাগল। অনেকের হেচকি শুরু হল।

ইমাম সাহেব তাদেরকে তাসাল্লী দিলেন। বললেন, বন্ধুরা! দিলের ভিতরে পরিবর্তন সৃষ্টি করো। তওবা করো। গুনাহ্ থেকে পলায়ন করো। মৌসুম যেমন বদলায়, ঠিক সেভাবে বদলে যাও। আমাদের রব মহানুভব, উদার ও অত্যন্ত দয়ালু। বন্ধুরা! রব্বে করীমের উপর ভরসা করো। দেখতে পাবে, করুণাময় স্রষ্টা খুব দ্রুত তোমার উপর সন্তুষ্ট হবেন এবং তোমার মাথায় ইয্যত ও অনুগ্রহের তাজ বসিয়ে দিবেন।

সবশেষে ইমাম সাহেব দোআ করলেন, হে রব্বে যুল-জালাল! আমরা তোমার আলীশান দরবারের ভিক্ষুক। যে তোমার উঠানে আসে, সে নিরাশ ফিরে যায় না। আমরা ভিক্ষার হাত তোমার সামনে প্রসারিত করেছি। তুমি অসীম দয়ালু। তোমার অনুগ্রহের ভাণ্ডার অফুরন্ত। মাফ করে দেওয়া তোমার মহান বৈশিষ্ট্য। তওবাকারী ও ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে তুমি খুব পছন্দ কর। আমরা গুনাহগার বান্দা তোমার কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইছি। আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও। আমাদেরকে বদ কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দাও। আমাদেরকে নেকীর জীবন দান করো।
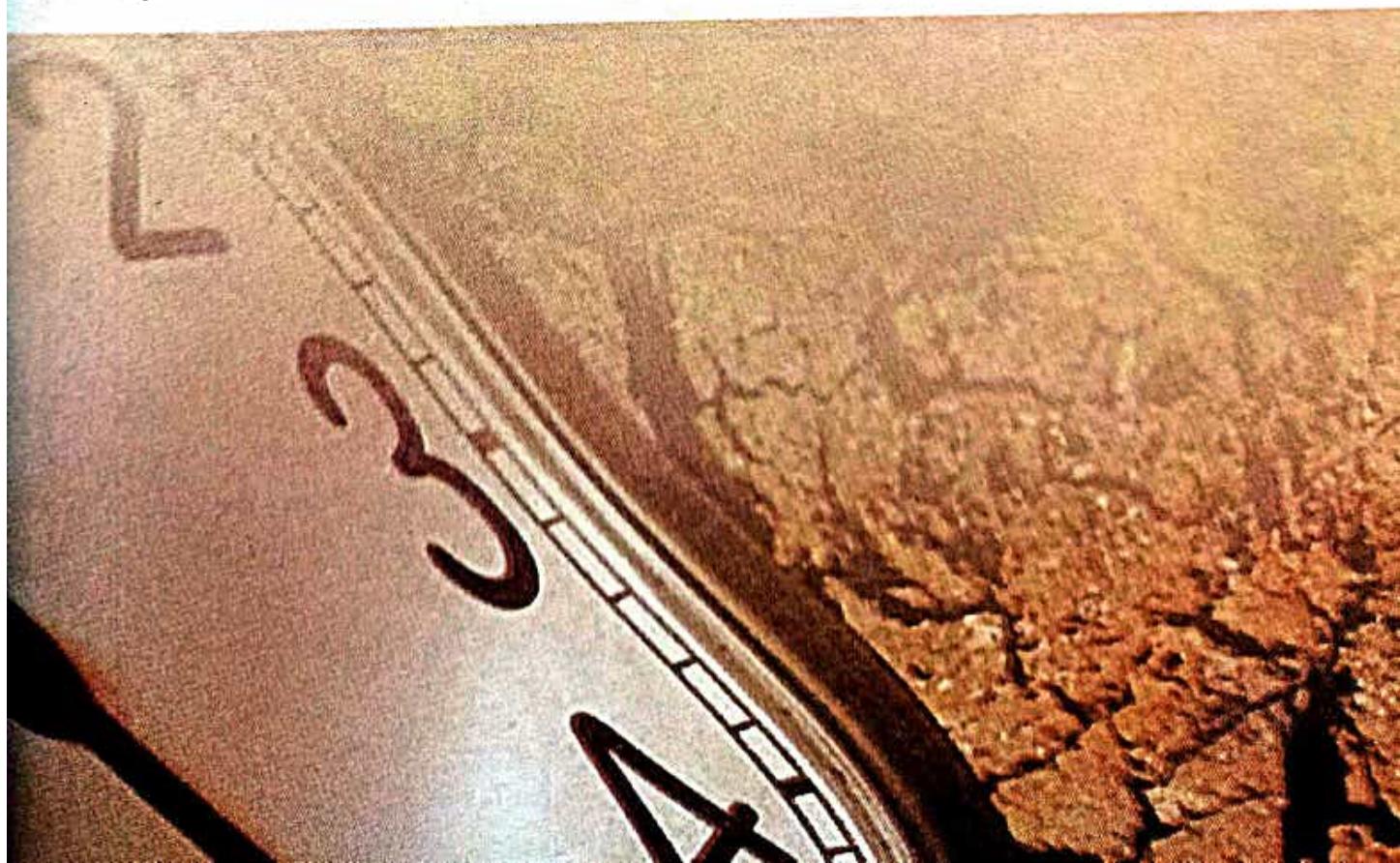
ইমাম সাহেব যখন এভাবে দোআ করছিলেন, তখন পাপ-পঙ্কিলতার আখড়া নাচঘরে 'আমীন' 'আমীন' পবিত্র ধ্বনীতে গুঞ্জরিত হচ্ছিল। ইমাম সাহেব অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। নাচঘর থেকে বের হয়ে চলে গেলেন মসজিদের দিকে। তাঁর পিছনে পিছনে বের হলো নাচঘরের সমস্ত দর্শক। সবাই এই মহান ইমামের হাতে তওবা করল। তারা বুঝতে পারল, জীবনের গুরুত্ব। আরও বুঝতে পারল, এই নাচগান, রং-তামাশা কোন কাজে আসবে না, যখন হাতে হাতে আমলনামা দেওয়া হবে এবং পাপগুলো বিশাল আকার ধারণ করবে।

দর্শকদের সাথে তওবা করল নাচঘরের মালিকও। তার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হল সে।
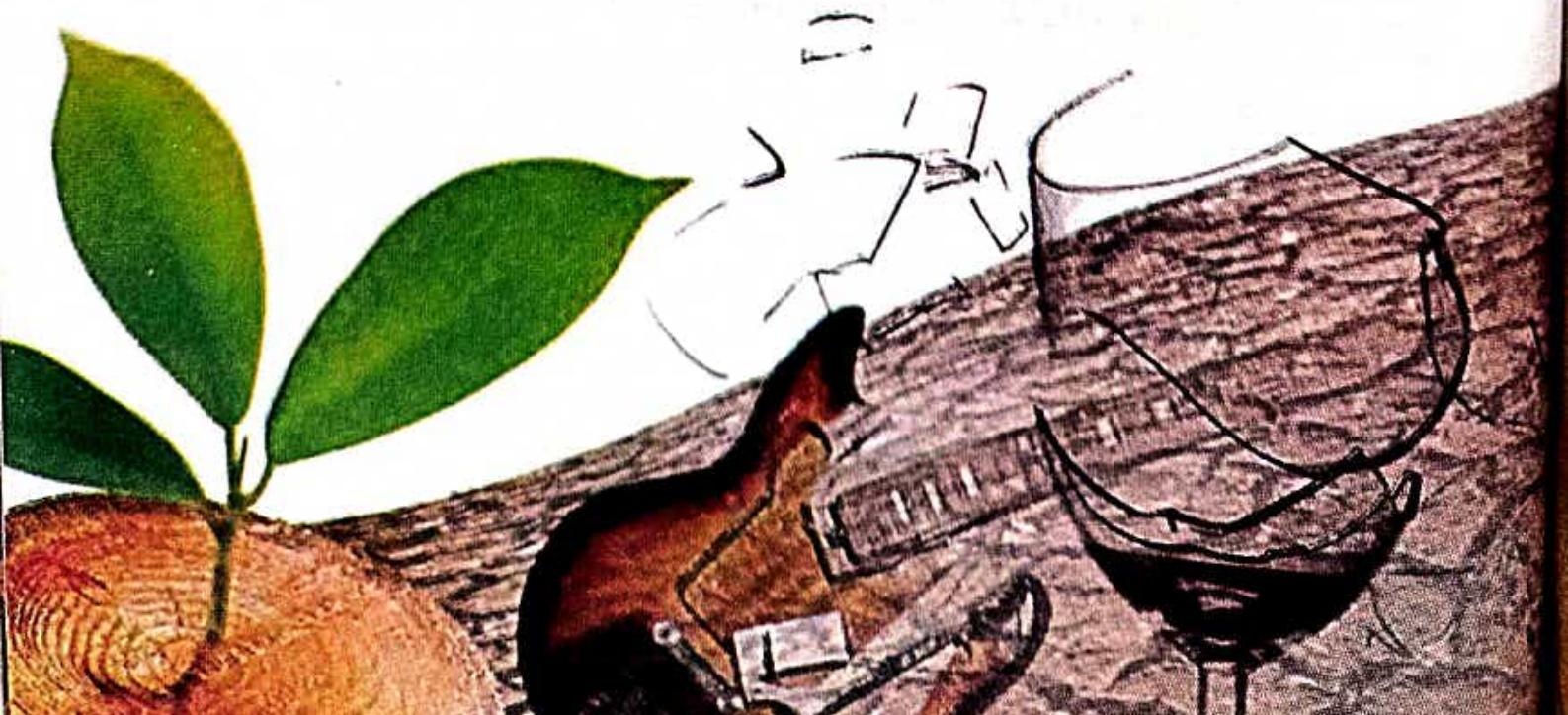
পথভ্রষ্ট নেতা

অনেক সময় মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করে। সত্যকে অনুসরণ করার জন্য তার মনও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু দুনিয়ার ভোগবিলাস তাকে প্রতারিত করে। ফলে সে আগের ভ্রষ্টতার উপর অধিষ্ঠিত থাকে। হাঁ, এমন লোকেরা প্রতারিত হয়, চাকুরি, সম্পদ, পদমর্যাদা অথবা বন্ধুত্বের কারণে। এবং এগুলোর কারণেই তারা দীনের উপর অবিচলতাকে বর্জন করে। প্রাধান্য দেয় দুনিয়ার জীবন। অথচ পরকালের জীবন উত্তম ও চিরস্থায়ী।

আ'শা ইবনে কায়স ছিল একজন খ্যাতনামা আরব কবি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর থেকে তাঁর বিরোধিতা করলেও জীবনের শেষ বয়সে ইসলাম গ্রহণের জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। নিজের আবাসভূমি নাজদের ইয়ামামা থেকে বের হয় সে। রওয়ানা দেয় নবীজীর সাথে দেখা করার জন্য মদীনার উদ্দেশে। লক্ষ আর কিছু নয়, ইসলাম কবুল করে মুসলমানদের কাতারভুক্ত হয়ে যাওয়া।
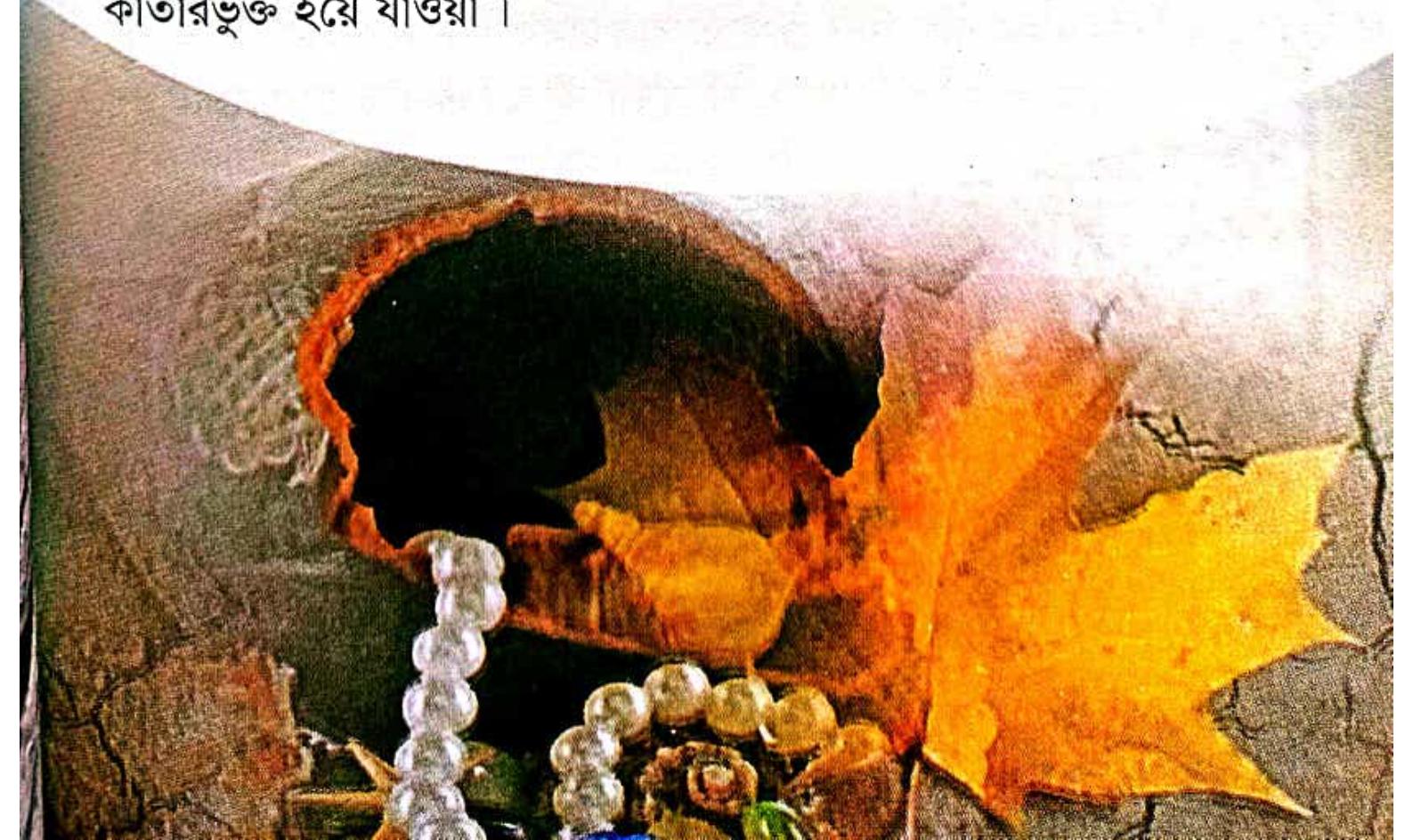
সোয়ারীতে ওঠে আ'শা। চলতে থাকে মদীনার দিকে। তখন তার অন্তরে রসুলুল্লাহর সাথে দেখা করার এক দুর্দমনীয় স্পৃহা। সেই স্পৃহাই কাব্যে পরিণত হয়ে আবৃত্ত হতে থাকে মুখে–

أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْناكَ لَيْلَةَ أَرْمَدا
وعادَكَ ما عادَ السَّلِيمَ الْمُسَهَّدا

নিশ্চয় তুমি এমনভাবে রাত অতিবাহিত করেছ, যেভাবে চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত ব্যক্তি রাত অতিবাহিত করে। তোমার অবস্থা হয়েছে সেই ব্যক্তির মত, যাকে সাপ দংশন করেছে।

أَلاَ أَيُّهذا السَّائِلِي أَيْنَ يَمَّمَتْ
فَإِنَّ لَهَا فِي أَهْلِ يَثْـــرِبَ مَوْعِـدَا

ওই ব্যক্তি জেনে রেখো, যে জানতে চাও যে, আমার উটের রোখ কোন্ দিকে? নিশ্চয় আমার উটের অঙ্গীকারের স্থান রয়েছে ইয়াসরিববাসীদের কাছে।

نَبِيٌّ يَرَى ما لا تَرَوْنَ وذِكْـــرُهُ
أَغارَ لَعَمْــــرِي في البلادِ وأَنْجَدا

তিনি এমন নবী, যিনি দেখতে পান এসব জিনিস, যেগুলো তোমরা দেখতে পাও না। আমার জীবনের কসম! তাঁর আলোচনা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাঁর জামাত রয়েছে সর্বত্র।

أَجِدَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وُصَاةَ مُحَمَّدٍ
نَبِيِّ الإِلَهِ، حِيـــنَ أَوْصَى وَأَشْهَدَا

নিঃসন্দেহে তুমি আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপদেশ গ্রহণ করনি, অথচ লোকজন তাঁর ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে।

إذا أنْتَ لمْ ترْحَلْ بزَادٍ مِنَ التقّى
وَلاقيْتَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَن قد تزَوّدَا

যখন তুমি দুনিয়া থেকে নেক আমলের পাথেয় সংগ্রহ করলে না এবং মৃত্যুর পর সেই তোমার সাক্ষাৎ হল সেই ব্যক্তির সাথে, যে দুনিয়া থেকে তাকওয়ার পাথেয় নিয়ে গেছে,

نَدِمْتَ على أنْ لا تَكُونَ كمِثْلِهِ،
وأنكَ لمْ ترصــــدْ لما كانَ أرصدا

তুমি নিজের অবহেলার উপর লজ্জিত হবে। কেননা, সেই বস্তুর প্রস্তুতি গ্রহণ করনি, যার জন্য সে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।

এভাবে সে শস্যশ্যামল ও মরু অঞ্চল পারি দিয়ে এগিয়ে চলছিল। নবীজীর সাক্ষাৎ ও আশীর্বাদ ছিল তার উদ্দীপনার মূল। মূর্তিপূজা ছেড়ে ইসলামের আগ্রহ ছিল প্রবল।

চলতে চলতে একসময় মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে গেল সে। তখন কিছু মুশরিক তার পথ রোধ করে সফরের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করল। জওয়াবে সে জানাল যে, ইসলাম গ্রহণের জন্য নবীজীর সাথে দেখা করা তার উদ্দেশ্য। জওয়াব শুনে মুশরিকরা ভয় পেয়ে গেল। কেননা, প্রখ্যাত এই কবি ইসলাম গ্রহণ করলে নবীজীর শক্তি বৃদ্ধি পাবে।
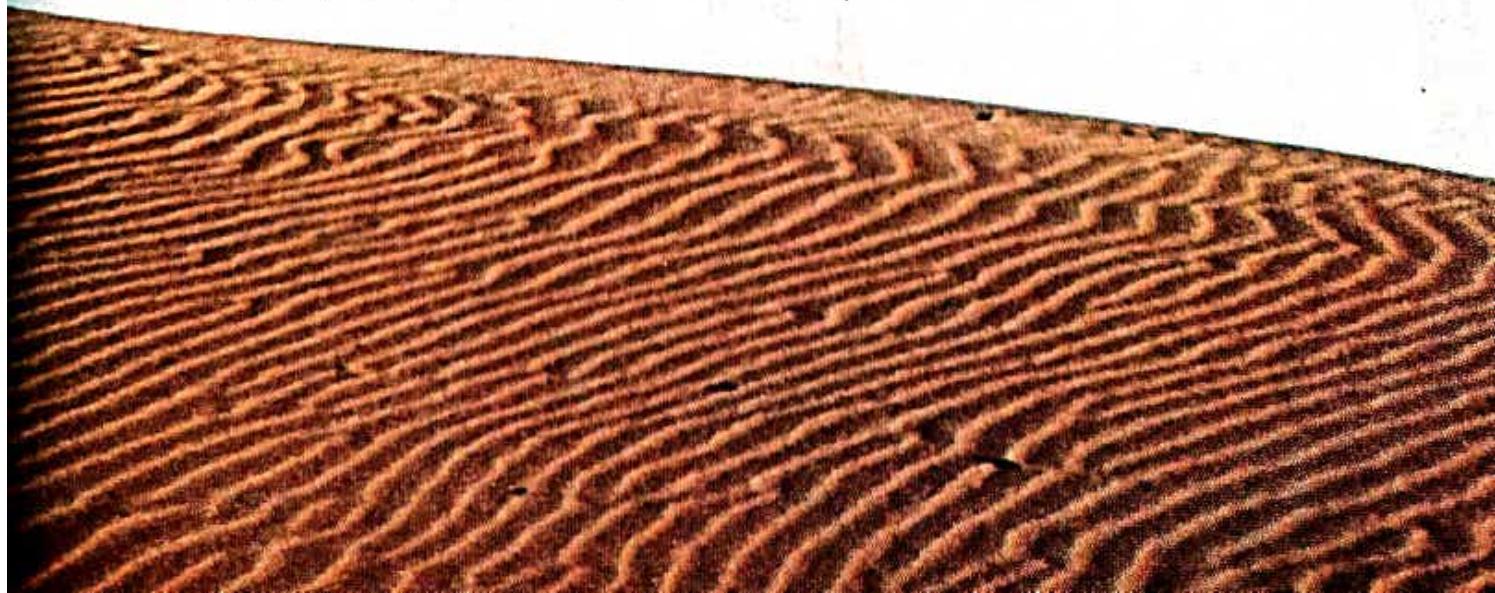
এক প্রখ্যাত কবি হাস্‌সান ইবনে সাবিত ইসলাম গ্রহণ করেই যা করেছেন, তাতেই মুশরিকদের নাকানি-চুবানির শেষ নেই। এখন যদি আবার এই মহান কবি আ'শা ইবনে কায়স ইসলাম কবুল করেন, তা হলে কোন্ দশা হবে?

মুশরিকরা তাকে ফেরানোর জন্য ফন্দি আঁটল। তারা বলল, আ'শা! তোমার ধর্ম এবং তোমার পিতৃপুরুষের ধর্মই তোমার জন্য উত্তম।

আ'শা বলল, না; তাঁর (মুহাম্মাদের) ধর্মই উত্তম ও সুদৃঢ়।

মুশরিকরা এবার নিজেদের দিকে চাওয়া-চাওয়ি শুরু করল। আ'শা ইবনে কায়সকে কীভাবে ইসলাম থেকে ফেরানো যায়, তা নিয়ে পরামর্শ করল তারা। তারা বলল, আ'শা ইসলাম তো যেনাকে হারাম বলে।

আ'শা ইবনে কায়স বলল, আমি বুড়ো মানুষ, নারীদের প্রতি এখন আর আমার কোন আকর্ষণ নেই।

মুশরিকরা বলল, ইসলাম তো মদকে হারাম সাব্যস্ত করে।
আ'শা জওয়াব দিল, মদ মস্তিষ্ক বিকৃত করে। মানুষকে খেলনায় পরিণত করে। সুতরাং মদ আমার প্রয়োজনের বাইরে।

মুশরিকরা যখন দেখল যে, আ'শা ইবনে কায়স ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর, তখন তারা যুক্তি উপস্থাপনের পন্থা ছেড়ে দিল। তারা বলল, আ'শা! আমরা তোমাকে একশ' উট দিচ্ছি। তুমি ইসলাম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা বাতিল করো এবং স্বদেশে ফিরে যাও।

একশ' উটের লোভনীয় প্রস্তাব পেয়ে ভাবতে শুরু করল আ'শা ইবনে কায়স। একশ' উট তো বিরাট সম্পদ। ভাবতে ভাবতে শয়তান তার উপর জয় লাভ করল। মুশরিকদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, আচ্ছা; সম্পদ যদি দাও, তা হলে তোমাদের প্রস্তাবে আমি রাজি।

মুশরিকরা একশ' উট জমা করে পেশ করল আ'শার সামনে। সে ওগুলো গ্রহণ করে প্রস্থান করল। কুফরে বহাল থেকেই নিজ কওমের কাছে ফিরে যেতে লাগল। আ'শা চলছে। সামনে তার উটের বহর। তার আনন্দ আর ধরে না। মনে হয় যেন কবিতা, সম্মান ও সম্পদ– সব একসাথে পেয়ে গেল সে। আল্লাহ তাআলার কাছে যে, পর্যবেক্ষণব্যবস্থা আছে, সে কথা সে ভুলে গেল। সবকিছু উপলব্ধি করার পর কীভাবে সে দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহর না-ফরমানীতে লিপ্ত হয়ে গেল? অথচ আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা।

উটের বহর নিয়ে আ'শা ইবনে কায়স নিজ এলাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেল। তারপর উট থেকে নামার আগেই জমীনে পড়ে গেল সে। হাঁটু ভেঙে গেল। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় কুল ধ্বংস করে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিল। এই লোকসান অন্তহীন।
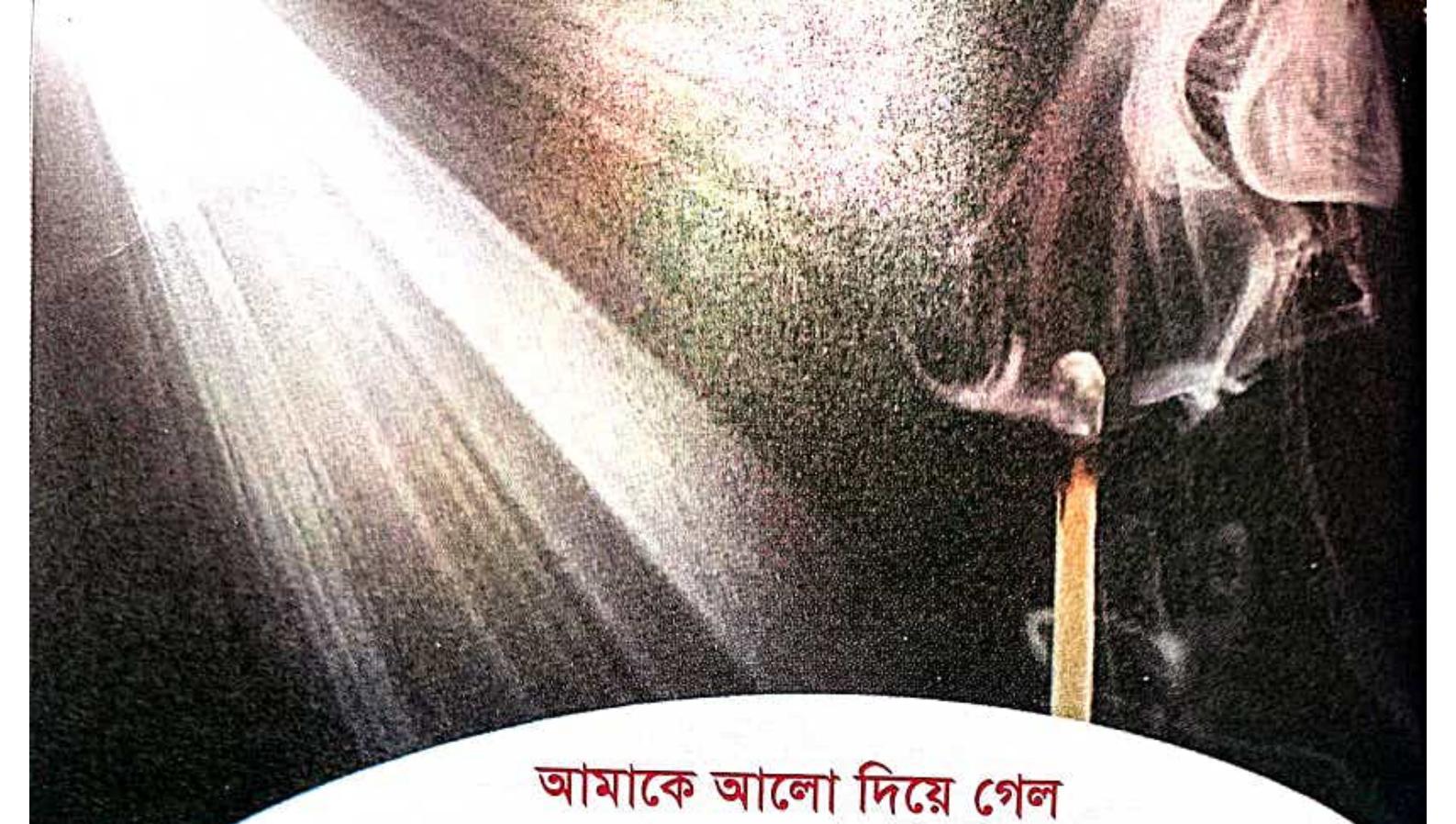
আমাকে আলো দিয়ে গেল

লাল বাতি জ্বলে উঠল। পুরো সড়কের বহু দূর পর্যন্ত গাড়ি দিয়ে ঠাঁসা। ওদিকে যে সময়ে পৌঁছনোর কথা, তার মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। এখন আমার কী করা উচিত? ভাবতে লাগলাম। রাগ আর পেরেশানীতে আমার অবস্থা ছিল খুব খারাপ। লাল বাতির কপালে ছাই পড়ুক, সে যে কখন জ্বলছে, নেভার নাম নেই। ইস, আমি যদি সবার আগে থাকতাম, তা হলে মুহূর্তের মধ্যে সিগ্ন্যাল ক্রস করে যেতে পারতাম। ঘড়ি আশঙ্কার সঙ্কেত দিচ্ছিল। যাক, সবুজ বাতি জ্বলল। আমি হর্নের বাটনের উপর আঙুল চেপে রাখলাম। এতে অন্য গাড়িওয়ালারা পেরেশান হয়ে গেল। স্থির গাড়িগুলো সচল হয়ে উঠল। আমি একেক করে ক্রস করতে লাগলাম সেগুলো। আমার ঝুঁকিপূর্ণ ড্রাইভিং অন্যদেরকে আতঙ্কে ফেলে দিল। আমার গাড়ি তো প্রায় অন্য গাড়ির সাথে টক্কর দিয়েই সারছিল। চেষ্টা করছিলাম, যাতে উড়াল দিয়ে বন্ধুদের সাথে মিলিত হতে পারি। কিন্তু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। বন্ধুদেরকে ধরতে পারলাম না। ভাবতে লাগলাম, এখন তা হলে কোথায় যেতে পারি? দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লাম, আহ! বন্ধুদের গন্তব্য যদি আমার জানা থাকত।

আমার গাড়ি খুব স্বাভাবিকভাবে চলছিল। আমি মগ্ন ছিলাম গভীর ভাবনায়। ইতিমধ্যে অন্য গাড়ির হর্ন আমাকে ভাবনার জগৎ থেকে

ফিরিয়ে আনল। আমি খুব বিরক্তি নিয়ে হর্নদাতা গাড়ির মালিকের দিকে দেখলাম এবং হাতের ইশারায় বললাম, স্বাভাবিকভাবে চলুন। যত ইচ্ছা জোর দিন; কিন্তু উড়ে যেতে পারবেন না। আমার কয়েক মিনিট আগের অবস্থার কথা আমি ভুলে গেলাম।

মনে মনে স্থির করলাম আজকের রাতজাগরণ বাসায়ই অনুষ্ঠিত হবে। হাঁ, বিষয়টা মন্দও নয়। আমার ছোট মেয়ে অসুস্থ। ওর পাশে থাকা উচিত। আমি ফেরার পথ ধরলাম। রাস্তায় একটি ভিডিও'র দোকানের সামনে গাড়ি পার্ক করলাম। বেশ কিছু ফিল্ম কিনে বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম।

দরজা খুলে বাসায় প্রবেশ করলাম। স্ত্রীকে বললাম, সত্বর আমার চা-বিস্কুট আনো।

তিনি আমাকে উপদেশ দিতে শুরু করলেন, আহমাদ! আল্লাহকে ভয় করো।

আমি তার উপদেশ এককান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিলাম। হাতে নিলাম টেলিভিশনের রিমোট। ভিডিও ফিল্ম চালিয়ে দিলাম। মিউজিকের প্রচণ্ড আওয়াজে ঘর কাঁপতে লাগল। নেককার মহিলা মাথানত করে ফেললেন। দুঃখবেদনায় চুর হয়ে ধরা গলায় বললেন, আহমাদ! আল্লাহকে ভয় করো।

এরপর সে কামরা থেকে বের হয়ে গেল। মিউজিক তার মোটেও পছন্দ নয়। কামরায় বাদ্যের তালে তালে মিউজিক শুরু হল। আমি চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম, আর বিস্কুট খাচ্ছিলাম। দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল টেলিভিশনের উপর। ফিল্মের প্রথমাংশ শেষ হল। তারপর পূর্ণ হয়ে গেল দ্বিতীয়াংশও। ও দিকে ঘড়ির কাটায় তখন রাত তিনটা। আচানক ঘরের দরজার হ্যান্ডেল ঘুরে উঠল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, তুমি এখানে কী নিতে এসেছ?

আমার প্রশ্নে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল না। কোন জওয়াবও পাওয়া গেল না; বরং দরজা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করল আমার মেয়ে। একেবারে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ড নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল। একটু নড়লও না।

মেয়ে আরও কাছে এসে আমার সাথে ঘেঁসে দাঁড়াল। তারপর গভীর দৃষ্টিতে আমাকে দেখল। হটাৎ বলে উঠল, বাবা! আল্লাহকে ভয় করো। বাবা!! আল্লাহকে ভয় করো।

এতটুকু বলেই কম্পিত পদক্ষেপে আমার কামরা থেকে বের হয়ে গেল। আমি সারাহ, সারাহ বলে অনেক ডাকলাম। আমার ডাক নিষ্ফল ফিরে এল। মেয়ে কোন প্রকার সাড়া দিল না। আমি নিজের কাছে প্রশ্ন রাখলাম, এ কি আসলেই আমার মেয়ে সারা?

আমি উঠলাম। ওই কামরায় গিয়ে দেখলাম। সারা তার মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে। হাঁ, হাঁ! এ তো ও-ই। আমার নিজের কামরায় ফিরে এলাম। বন্ধ করে দিলাম টেলিভিশন। আচানক আমার কাছে মনে হল আমার কামরা যেন কামরা নয়; কোন গম্বুজ। সেখানে আমার মেয়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে– বাবা! আল্লাহকে ভয় করো; বাবা!! আল্লাহকে ভয় করো।

আমার শরীরের পশম খাড়া হয়ে গেল। ঘামে ভিজে গেল পুরো দেহ। কতক্ষণ আমার কী অবস্থা গেল, তার কিছুই বলতে পারব না। শুধু এতটুকু বলতে পারব যে, আমার আদুরে মেয়েটার আওয়াজে ভরে গিয়েছিল আমার কান– বাবা! আল্লাহকে ভয় করো; বাবা!! আল্লাহকে

ভয় করো। তার নিষ্পাপ চেহারার ছবিখানা আমার দৃষ্টির উপর ছেয়ে গেল এবং তার সতর্কীকরণ সেই আমার বুকের ভিতর প্রোথিত হতে লাগল। কতদিন থেকে যে আমি নামায পড়ি না, তার কোন হিসেব নেই। আহ্! আমি আমার প্রতিপালকের সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছি। আমার সকাল-সন্ধ্যা প্রভুর নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে পরিপূর্ণ। আমি গাফলতের পেয়ালা পান করেছি। আমার যৌবনের তাঁবু রঙ-বেরঙের ফিল্ম আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ঠাঁসা। আহ্! আমি কত দাম্ভিক। আমি দয়ালু ও মেহেরবান মাওলার চৌকাঠ ছেড়ে দিয়েছি। আমি যতই তাঁর দরবার থেকে দূরে সরেছি, ততই আমার উপর শয়তান জেঁকে বসেছে। এমন কোন্ গুনাহ্ আছে, যা আমি করিনি! এমন কোন মলিনতা আছে, যা আমাকে স্পর্শ করেনি! কিন্তু এখন মুহূর্তের মধ্যে কী হয়ে গেল! আমার মেয়ের আওয়াজের ঝঙ্কার আমাকে জাগিয়ে গেল। কেটে গেল গাফলতের ঘোর। আপনা-আপনি আমার হৃৎকম্প বেড়ে গেল। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমি জমীনে পড়ে গেলাম। ঘুমানোর অনেক চেষ্টা করলাম; কিন্তু চোখের দুই পাতা একত্র হল না। সময় খুব দ্রুত গড়িয়ে যেতে লাগল।

অতীত জীবনের কালো অধ্যায় চোখের সামনে ফিল্মের মত চলতে লাগল। খারাপ কাজের জন্য আমার মেয়ের কণ্ঠ আমাকে শাসাচ্ছিল, বাবা! আল্লাহকে ভয় করো; বাবা!! আল্লাহকে ভয় করো। এরই মধ্যে মুয়াজ্জিনের সুললিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। আমার কাছে মনে হল, আমার সামনে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত আলোর চাদর বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মৃদু কম্পন অনুভূত হল। ঝনঝনিয়ে উঠল দেমাগ। দেহও কেঁপে উঠল। মুয়াজ্জিন বলছিলেন, আস্সালাতু খায়রুম মিনান্নাওম। নামায ঘুমের চেয়ে উত্তম।

দিল বলে উঠল, মুয়াজ্জিন যা বলছেন, সেটাই এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সত্য। লজ্জা অনুভব করলাম। কত বড় আফসোসের কথা! আমি সারা জীবন শুয়েই থাকলাম। এই অনুভূতি দিল ও দেমাগের জগৎ ওলট-পালট করে দিল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। উযু করে রওয়ানা দিলাম মসজিদের দিকে। মসজিদের পথে নিজেকে আজনবী মনে হল।

প্রভাতী বায়ু আমাকে তিরস্কার করছিল, উদ্ভ্রান্ত পথিক! এতদিন কোথায় ছিলে? আকাশের পাখিগুলো মিষ্টি ভাষায় কথা বলছিল। তারা যেন আমায় বলছিল, খোশ আমদেদ! অবশেষে তুমি জাগ্রত হয়েছ তো!

আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। সুন্নত পড়লাম দুই রাকাত। কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত শুরু করলাম। কুরআন শরীফ পড়তে গিয়ে আমি আটকে যাচ্ছিলাম। কেননা, অনেক দিন হয় আমি কুরআন খুলি না।

আমার কাছে মনে হল, কুরআন আমাকে ভর্ৎসনা দিচ্ছে, তুমি আমাকে কত বছর থেকে ছেড়ে আছ; কিন্তু কেন? আমি তোমার রবের কালাম নই? আমি সুরা যুমারের এই আয়াতটি বার বার পড়লাম–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر : ٥٣]

তুমি বলে দাও, (আল্লাহ তাআলা বলছেন,) হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, তারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় তিনি সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল (ও) অত্যন্ত দয়ালু। *[সুরা যুমার : ৫৩]*

আমি হয়রান হয়ে গেলাম। আল্লাহু আকবার! সমস্ত গুনাহ এককলমে মাফ করে দেওয়ার ঘোষণা! আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর কত মেহেরবান, কত দয়ালু!

মন চাইছিল বন্ধ না করে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেই থাকি; কিন্তু মুয়াজ্জিন ইকামত বলে ফেললেন। আমি কিছুক্ষণ নিজের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে থাকলাম। তারপর লোকজনের সাথে আগে বাড়লাম।

নিজের কাছে আমাকে আজনবী মনে হচ্ছিল। নামায সম্পন্ন করে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকলাম। এরপর বাসায় ফিরলাম। কামরার দরজা খুললাম। স্ত্রী ও মেয়ে সারাকে দেখলাম। তারা ঘুমিয়ে ছিল। আমি নীরবে ফিরে এলাম এবং কাজের উদ্দেশে বেরিয়ে গেলাম।
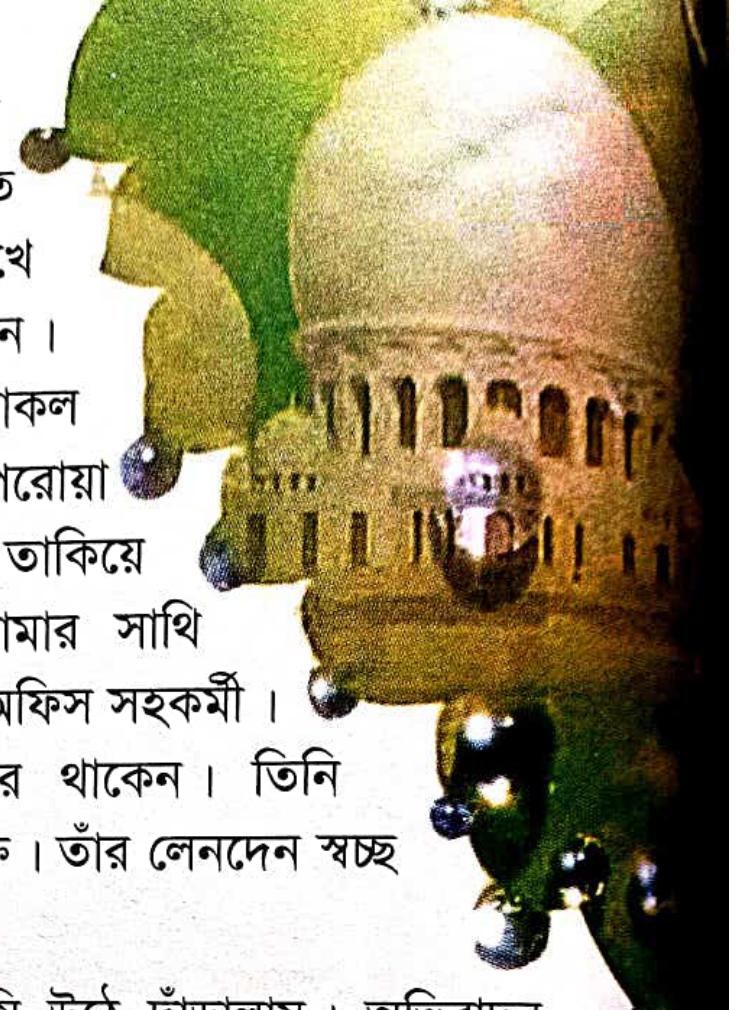
ভোরে কাজে উপস্থিত হওয়া আমার অভ্যাস ছিল না। এত সকালে আমাকে জাগ্রত দেখে সাথিসঙ্গী অবাক হয়ে গেলেন। তিরস্কারমূলক অভিবাদন চলতে থাকল আমার প্রতি। আমি কোন পরোয়া করলাম না। আমি পথপানে তাকিয়ে ছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম আমার সাথি ইবরাহীমের জন্য। তিনি আমার অফিস সহকর্মী। সবসময় আমাকে উপদেশ করে থাকেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও আখলাকী ব্যক্তি। তাঁর লেনদেন স্বচ্ছ এবং তার কথা পরিষ্কার।

একসময় ইবরাহীম এলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। অভিবাদন জানালাম তাঁকে। তাঁর চোখে বিস্ময়। তিনি বললেন, আহমাদ! আপনি?

আমি তাঁর হাত ধরে নিজের দিকে টান দিয়ে বললাম, আপনার সাথে আমার কথা আছে।

তিনি বললেন, আচ্ছা; আমরা অফিসে কথা সেরে ফেলি।

আমি বললাম, না; চলুন রেস্ট রুমে যাই।

ইবরাহীম নীরব হয়ে আমার কথা শোনার জন্য মনোযোগ দিলেন। আমি গতরাতের পুরো ঘটনা তাঁর কাছে বয়ান করলাম। প্রথমে তিনি তাজ্জব হয়ে আমার দিকে দেখলেন। তারপর তাঁর চোখে অশ্রু দেখা গেল। তিনি আনন্দে আন্দোলিত হলেন। তারপর অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন, ভাই গো! আল্লাহ তাআলা আপনার উপর মেহেরবান হয়ে গেছেন। অনুগ্রহ করে তিনি আপনার হৃদয়ে হেদায়েতের চেরাগ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এই চেরাগ হেফাজত করুন। গুনাহের ঝড়ো বাতাসে একে নেভাবেন না।

দিনটি আমার অত্যন্ত হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল।
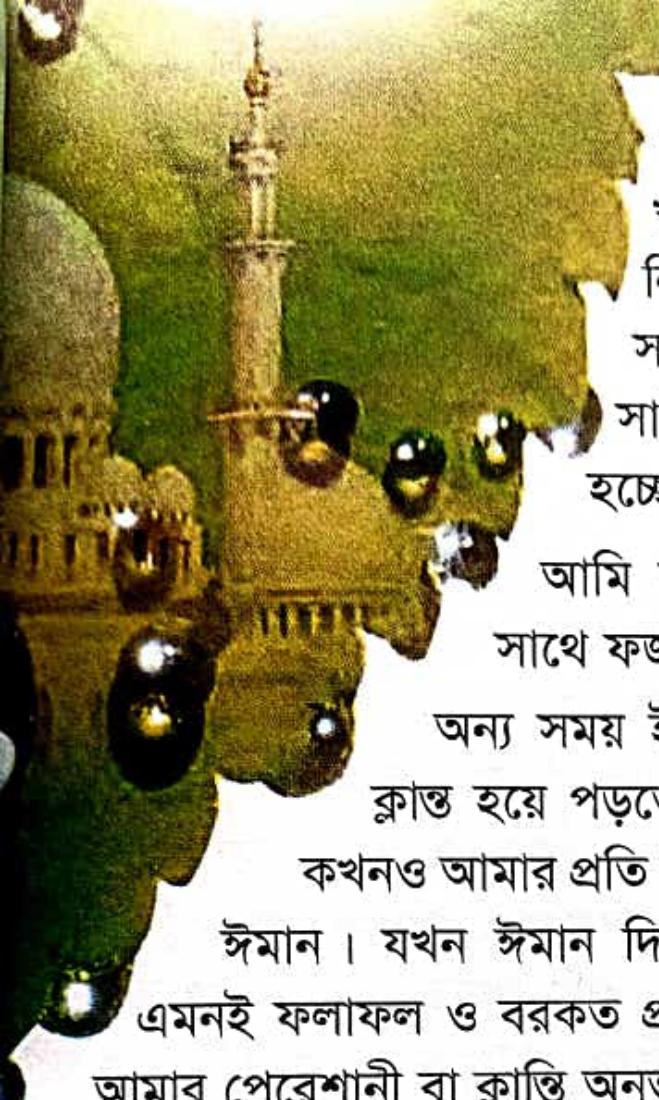
সারা রাত ঘুমাতে পারিনি। তারপরও খুব সুস্থির ছিলাম। পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজ করছিলাম। সাথিরা আমার সহযোগিতা কামনা করছিলেন। এক সাথি বললেন, আজ খুব সতেজ মনে হচ্ছে, ব্যাপার কী?

আমি জওয়াবে বললাম, এ হল জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায়ের বরকত।

অন্য সময় ইবরাহীম বেচারা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, আর আমি শুয়ে থাকতাম। তিনি কখনও আমার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। হাঁ, এ ছিল ঈমান। যখন ঈমান দিলের রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এমনই ফলাফল ও বরকত প্রকাশ পায়। সময় বয়ে যেতে থাকল; আমার পেরেশানী বা ক্লান্তি অনুভূত হল না।

ইবরাহীম বললেন, আপনি বাসায় যান। সারা রাত আপনি ঘুমাননি। আপনার কাজগুলো আমি করে দিচ্ছি।

আমি ঘড়ি দেখলাম। যোহরের নামাযের সামান্য দেরি ছিল। আমি কাজ করতে থাকলাম। এর মধ্যে মুয়াজ্জিন আযান দিলেন। আমি সাথে সাথে মসজিদে চলে গেলাম। প্রথম কাতারে গিয়ে বসে পড়লাম। বিগত দিনগুলোর উপর আফসোস হচ্ছিল এবং খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম। কেননা, নামাযের সময় আমি কাজ ছেড়ে পলায়ন করতাম এবং আজারে-বাজারে ঘুরে বেড়াতাম।

নামায শেষ করে বাসার দিকে রওয়ানা দিলাম। রাস্তায় সারা'র কথা মনে পড়ে অস্থিরতা অনুভূত হতে তাকে। কে জানে, সারা কেমন আছে! আমার বুকের ভিতরে ব্যথা অনুভব হচ্ছিল। কেন যে, তার কারণ বলতে পারব না।

আমি আসমানের দিকে তাকিয়ে হাত তুললাম। দোআ করলাম, হে আল্লাহ! তুমি সত্বর আমার মেয়েকে সুস্থতা দান করো।

বাসায় পৌঁছলাম। দরজা খুলে স্ত্রীকে আওয়াজ দিলাম। কোন জওয়াব পাওয়া গেল না। তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমার স্ত্রী অঝোরে কাঁদছিলেন। তিনি আমাকে দেখে আরও জোরে কাঁদতে লাগলেন, সারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল। আহ! মেয়েটা মরে গেল। আল্লাহর কাছে চলে গেল।...

আমি তার কথা বুঝতে পারছিলাম না। সারার দিকে নজর দিলাম। আমার বুকের সাথে ওকে চেপে ধরলাম। উঠানোর চেষ্টা করলাম; কিন্তু তার হাত ঢলে পড়ে গেল। তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। থেমে গিয়েছিল শিরা। আমি ওর চেহারার দিকে দেখলাম। একেবারে হাস্যোজ্জ্বল মনে হল। মনে হল একটি আসমানী মাখলুক; একটি উজ্জ্বল তারকা। আমি ওকে জাগাতে চেষ্টা করলাম; ডাকলাম। আমার ডাক বিনা উত্তরে প্রতিধ্বনিত হল। ওর মা ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। সারা সারা বলে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু ও তো চলে গেছে।

এই দুনিয়াতে নেই। আমিও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, আমার মেয়ের চোখে মৃত্যুঘুম জায়গা করে নিয়েছে। সবকিছু আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল অনবরত। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। আমি সারার চাঁদমুখ আর রেশমি চুলের দিকে তাকালাম। ওকে চুমু দিলাম। আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে, সারা বলছে, আফসোস, বাবা! তুমি অনেক দেরি করে ফেলেছ। এখন তুমি দিনের বেলায় বাতি জ্বালাচ্ছ।

আমি বার বার পড়তে থাকলাম–

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

ইবরাহীমকে ফোন দিলাম, তাড়াতাড়ি এসে পড়ুন। সারা আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছে।

বাসার অন্য নারীরা আমার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে সারাকে গোসল দিলেন। গোসল শেষে সারার পবিত্র দেহে কাফন পরিয়ে দিলেন তারা। এরপর আমার স্ত্রী আমাকে ডাকলেন। আমি সারাকে বিদায় জানানোর জন্য আগে বাড়লাম। পড়ে যেতে লাগছিলাম; কোন রকমে নিজেকে সামলে নিলাম। সারার কপালে চুমু দিলাম। ওকে ওয়াদা দিলাম আজ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমি দীনের উপর অবিচল থাকব। এরপর ওর মায়ের দিকে তাকালাম। তাঁর চোখ থেকে তখন অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হচ্ছিল।

আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, সবর করো। ইনশা আল্লাহ আমাদের সারা জান্নাতে চলে গেছে। আমরা গিয়ে একদিন ওর সাথে মিলিত হব। আশা রাখো, ও আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। এরপর আমি আল্লাহ তাআলা কালাম থেকে এই আয়াতটি পড়লাম–

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [الطور : ٢١]

যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানাদিও ঈমানের সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি (জান্নাতে) তাদের সন্তানাদিকে তাদের সাথে মিলিয়ে দিব। আমি তাদের আমল থেকে সামান্যও কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের সাথে বন্দী। *[সুরা তুর : ২১]*

আমরা সারার জানাযা-নামায পড়লাম। তারপর ওকে কবরস্তানে নিয়ে গেলাম। আমি ওর প্রাণহীন দেহের দিকে তাকালাম। মনে হল, আমি সেই নুরের উৎসের দিকে দেখছি, যা আমার জীবনে আলোর মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে। এরপর কবরস্তানের নীরব প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কবরের পাশে দাঁড়ালাম আমি। ইবরাহীম আমার কাঁধে হাত রেখে তাসাল্লী দিলেন, আহমাদ! সবর করো। আমি কবরে নামলাম। আমার দিল ও দেমাগ ঝাঁকুনি দিয়ে বলতে লাগল, আহমাদ! এটাই তোমার ঘর। আজ অথবা কাল, বিলম্বে অথবা তাড়াতাড়ি অন্যের কাঁধে চড়ে তুমিও এখানে আসবে। তুমি সেজন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?

ইবরাহীম আওয়াজ দিলেন, নাও; মেয়েকে ধরো। আমি ওকে বুকের সাথে চেপে ধরলাম। চুমু দিলাম। তারপর ডান কাতে কবরে শুইয়ে দিলাম। পড়লাম এই দোআটি–

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ.

আল্লাহর নাম নিয়ে রসুলুল্লাহর তরীকায় আমরা তোমাকে দাফন করছি।

কঠিন পরীক্ষা

কাআব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আন্হু একজন বৃদ্ধ। চলুন, আমরা তাঁর সাথে একটু বসি, যখন তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন; তাঁর হাড়গোড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। তিনি তাঁর যৌবনের স্মৃতিচারণ করছেন। বলছেন তাবুক-যুদ্ধ থেকে বাদপড়ার কাহিনী।

তাবুক-যুদ্ধ ছিল রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ যুদ্ধ। তিনি যুদ্ধ-যাত্রার ঘোষণা দিয়ে দিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, লোকজন যুদ্ধ-যাত্রার প্রস্তুতি সম্পন্ন করুক। লশকর তৈরি করার জন্য মানুষের কাছ তিনি চাঁদাও নিলেন। দেখতে দেখতে ত্রিশ হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী তৈরি হয়ে গেল। মৌসুমটি ছিল গ্রীষ্মকাল। ফসল কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছিল। সফরও ছিল অনেক দীর্ঘ। শত্রুপক্ষ অনেক শক্তিশালী, গোঁয়ার। মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অনেক; তবে তাদের নামসমূহ কোন নথিভুক্ত ছিল না।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় যেমন এসেছে, কাআব বলেন, তখন আমি বেশ খোশহালেই ছিলাম। প্রস্তুত করেছিলাম দুটি বাহন। আমি জেহাদের জন্য মানসিকভাবে পূর্ণ প্রস্তুতও ছিলাম। এরপরও মৌসুমের প্রতি, ফসল পাকার প্রতি আমার অন্তরে ঝোঁক ছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ করে একদিন সকালে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হয়ে গেলেন।

আমি তখন মনে মনে বললাম, আগামী কাল আমি বাজারে যাব; জেহাদের কিছু আসবাবপত্র কিনব; তারপর আমি গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হব। কথামত পরদিন সকালে বাজারে গেলাম। একটি বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হল এবং আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। মনে মনে বললাম, ইনশা আল্লাহ আগামী কাল রওয়ানা হব এবং তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। কিন্তু আবারও একটি বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হল।

আবারও মনে মনে বললাম, ইনশা আল্লাহ আগামী কাল রওয়ানা হব। এভাবে চলে গেল কয়েক দিন। আমি ইসলামী লশকর থেকে পিছনে রয়ে গেলাম। তখন আমি বাজারে বাজারে হাঁটতাম এবং মদীনায় ঘুরে বেড়াতাম। আমার নজরে পড়ত শুধু দুই ধরণের মানুষ– যাদের কপালে মুনাফেকি অবধারিত হয়ে গেছে, অথবা অন্ধ বা খোড়া ব্যক্তিরা, আল্লাহ যাদেরকে অপারগ সাব্যস্ত করেছেন।

হাঁ, কাআব মদীনায় রয়ে গেলেন। রসুলুল্লাহ কিন্তু ত্রিশ হাজার সঙ্গী নিয়ে চলেন গেছেন। তিনি গিয়ে পৌঁছলেন তাবুকে। তিনি নজর বুলালেন সাহাবায়ে কেরামের চেহারায়। দেখলেন, বাইআতে আকাবায় শরীক হওয়া একজন নেককার মানুষ তাদের মধ্যে নেই। তিনি বললেন–

কাআব ইবনে মালেকের কী হয়েছে?

একজন জওয়াব দিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! তাঁর চাদরদ্বয় এবং তাঁর বাহুদ্বয়ের উপর গৌরবদৃষ্টি তাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে।

তখন মুআয ইবনে জাবাল বললেন, কত খারাপ কথা আপনি বললেন! হে আল্লাহর রসুল! আমরা যতদূর জানি, তিনি একজন ভালো লোক।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন।

কাআব বলেন, যখন নবীজী তাবুক-যুদ্ধ সম্পন্ন করলেন এবং মদীনা-অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন আমি কীভাবে তাঁর অসন্তোষ থেকে রক্ষা পাব, তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এ বিষয়ে আমি পরিবারের লোকজনের নিকট থেকে পরামর্শও নিলাম। তারপর যখন তিনি মদীনায় পৌঁছে গেলেন, তখন আমি বুঝে ফেললাম যে, সত্যের আশ্রয় না নিলে আমার রক্ষা নেই।

নবীজী মদীনায় প্রবেশ করলেন। আগে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন তিনি। তারপর উপবেশন করলেন মানুষের অজুহাত শোনার জন্য। তখন পিছনে থেকে যাওয়া লোকজন আসতে লাগল এবং তারা ওজর পেশ করে কসম করতে লাগল। তারা সংখ্যায় ছিল আশির কিছু বেশি। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাহ্য কৈফিয়ত মেনে নিয়ে তাদের জন্য দোআ করলেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহর হাওলায় ছেড়ে দিলেন।

কাআব ইবনে মালেক এলেন নবীজীর কাছে। যখন তিনি সালাম দিলেন, তখন তিনি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মত হাসলেন। তারপর তাঁকে বললেন, এগিয়ে আসো।

কাআব এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। যখন তিনি সামনে গিয়ে বসলেন, তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

তুমি কেন পিছনে পড়েছিলে? তুমি না বাহন কিনেছিলে?

কাআব বললেন, হাঁ; অবশ্যই।

তা হলে পিছনে পড়লে কেন?

কাআব বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আমি যদি দুনিয়ার অন্য কারও কাছে বসতাম, তা হলে আমি জানি, আমি কোন ওজর পেশ করে তার রোষ থেকে রক্ষা পেতাম। কারণ, আমার প্রতারণা করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি, আজ যদি আমি আপনাকে

সন্তুষ্ট করার জন্য কোন মিথ্যা কথা বলি, তা হলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমার উপর নাখোশ করে দিবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি, তা হলে আপনি আমার উপর নাখোশ হবেন; কিন্তু আমি তাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা করি। ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার কোন ওজর ছিল না। আল্লাহর কসম! এখন আমি যতটা শক্তিশালী এবং সাচ্ছন্দ্যে আছি, আগে কখনও এমন ছিলাম না।

এতদূর বলে কাআব থেমে গেলেন। নবীজী সাহাবায়ে কেরামের দিকে লক্ষ করে বললেন–

এই যে লোকটি, এ সত্য কথা বলেছে। আচ্ছা, তুমি যাও। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ ফয়সালা করবেন।
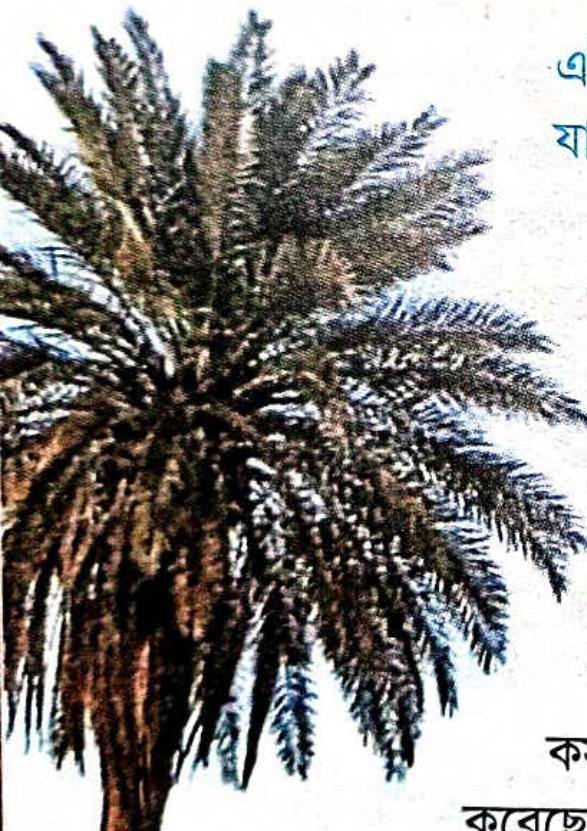
ধীর পদক্ষেপে উঠলেন কাআব। চিন্তিত ও বিষণ্ন অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হলেন। তিনি জানেন না আল্লাহ তাঁর ব্যাপারে কী ফয়সালা করবেন।

তাঁর এই আত্মসমর্পণ যখন তাঁর কওমের লোকজন দেখলেন, তখন কিছু লোক তাঁর পিছু নিল। তারা তিরস্কার করে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! এর আগে আপনি কখনও কোন অপরাধ করেছেন বলে আমরা জানি না। আপনি একজন কবি। কিন্তু তারপরও অন্যরা যেমন রসুলুল্লাহর কাছে ওজর পেশ করে গেল, তেমন ওজর পেশ করতে ব্যর্থ হলেন? আপনি কেন এমন কোন ওজর তুলে ধরলেন না, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন? তারপর তিনি আপনার জন্য এস্তেগ্‌ফার করতেন এবং আল্লাহ আপনাকে মাফ করে দিতেন।

কাআব বলেন, এভাবে তারা আমাকে তিরস্কার করতে থাকে। এমন কি আমি ভাবতে লাগলাম যে, আমি পুনরায় যাব এবং আমার বক্তব্য পরিহার করব। আমি তখন বললাম, আচ্ছা, আমার মত সমস্যায় কি আর কেউ পতিত হয়েছে?

লোকজন বলল, হাঁ; দু'জন লোক আপনার মত কথাই বলেছেন এবং তাদেরকে আপনার মত জওয়াবই দেওয়া হয়েছে।

আমি বললাম, তারা দু'জন কারা?

লোকজন বলল, মুরারা ইবনে রবী' ও হেলাল ইবনে উমাইয়া।

তাঁরা দু'জন নেককার লোক। তাঁরা বদরে অংশ নিয়েছেন। তাদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ। একথা ভেবে আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি কখনই পুনরায় যাব না এবং বক্তব্যও প্রত্যাহার করব না।

তারপর কাআব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু'র দিনাতিপাত হতে থাকল একা; বিদীর্ণ হৃদয়ে। তিনি নিজের বাড়িতে বসে গেলেন। অল্প সময়ের মধ্যে নবীজী কাআব ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের সাথে লোকজনকে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন।

কাআব বলেন, তখন লোকজন আমাদেরকে ছেড়ে দিল। তারা আমাদের জন্য হয়ে গেল অপরিচিতের মতন। আমি বাজারে যেতাম; কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। তারা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মনে হত যেন আমি তাদেরকে চিনিই না। বাগানগুলোও বদলে গেল। ওগুলো যেন আমাদের পরিচিত নয়। দুনিয়াই আমাদের জন্য বদলে গেল। আমরা যেন নতুন কোন দুনিয়াতে চলে গেলাম।
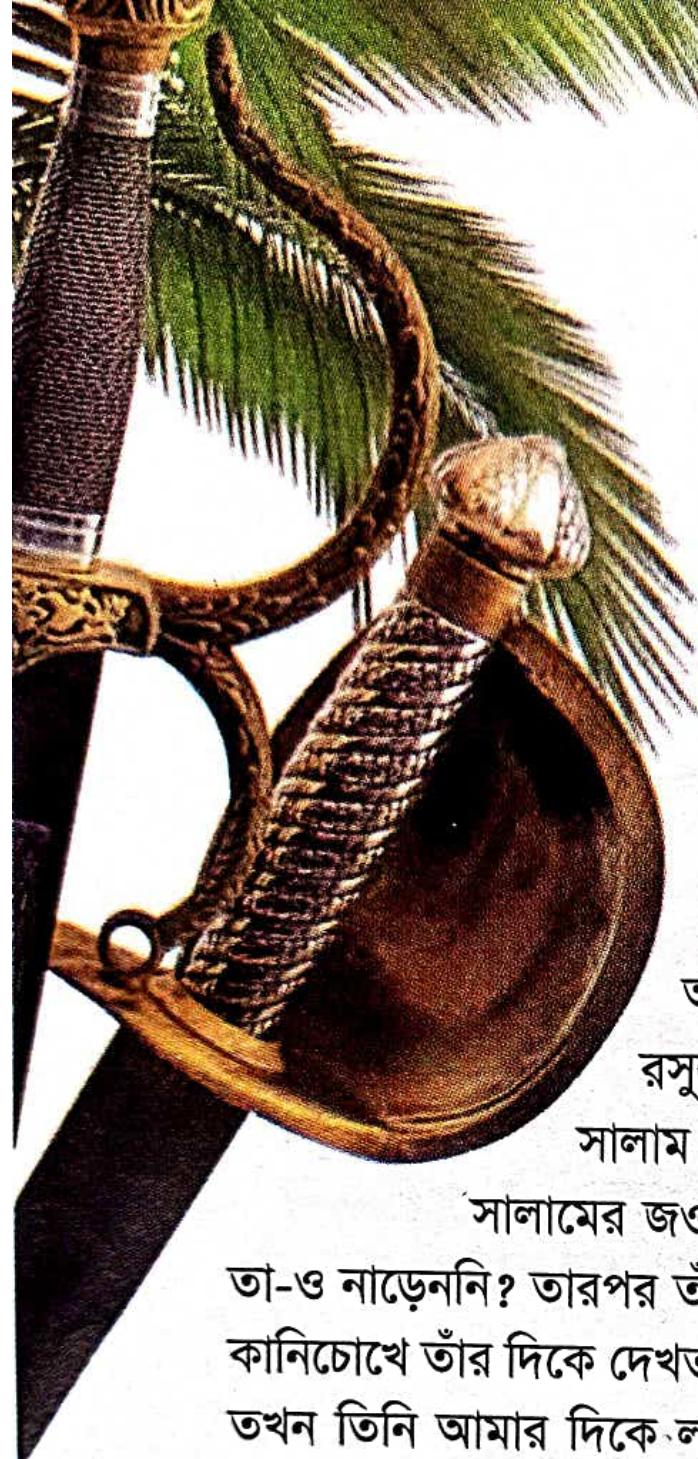
আমার সঙ্গীদ্বয় তাদের বাড়িতে বসে কাঁদতে শুরু করলেন। তাদের দিনরাতের কাজই শুধু কান্না। তাঁরা কখনও মাথা উঁচু করেন না। তাঁরা এবাদত করতে লাগলেন পুরোহিতদের মত। এই তিনজনের মধ্যে আমি ছিলাম সবচেয়ে কম বয়সের এবং সবচেয়ে চঞ্চল। এজন্য বাড়ি থেকে বের হতাম। মুসলমানদের সাথে জামাতে নামায পড়তাম। বাজারে ঘুরে বেড়াতাম। তবে কেউ আমার সাথে কথা বলত না।

আমি এসে মসজিদে প্রবেশ করতাম। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিতাম আর মনে মনে বলতাম, তিনি কি সালামের জওয়াব দেওয়ার জন্য ঠোঁট নেড়েছেন, না কি তা-ও নাড়েননি? তারপর তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে নামায পড়তাম এবং কানিচোখে তাঁর দিকে দেখতাম। আমি যখন নামাযে মনোযোগ দিতাম, তখন তিনি আমার দিকে লক্ষ করতেন। আর যখন আমি তাঁর দিকে লক্ষ করতাম, তখন তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

এভাবেই গড়িয়ে যেতে লাগল কাআবের দিনরাত। বেদনা আরও বেদনা জন্ম দেয়। তিনি তাঁর কওমের স্বনামধন্য ব্যক্তি। বরং তিনি একজন প্রাজ্ঞ কবি। রাজাবাদশা ও আমীর-উমরাগণ তাঁকে চিনতেন। তাঁর কবিতা পৌঁছে গিয়েছিল আশপাশের শিক্ষিত সমাজে। তাদের সাধ ছিল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার।

আজ তিনি মদীনায় নিজের কওমের কাছে রয়েছেন; কিন্তু কেউ তাঁর সাথে কথা বলে না। তাঁর দিকে ভ্রুক্ষেপও করে না। এভাবে যখন তাঁর অসহায়ত্ব চরমে এবং সঙ্কট চতুর্মুখী, তখন নেমে এল আরেকটি পরীক্ষা। তিনি একদিন বাজারে ঘুরছিলেন।

হঠাৎ দেখা গেল শাম থেকে আগত এক খ্রিস্টানকে। সে বলল, আমাকে কাআব ইবনে মালেকের সন্ধান কে দিতে পারবে?

লোকজন ইশারা করে কাআবকে দেখিয়ে দিল। লোকটি তাঁর কাছে এগিয়ে এল এবং গাস্‌সানের সম্রাটের একটি পত্র তাঁর হাতে তুলে দিল। আজব ব্যাপার! গাস্‌সান-সম্রাটের পত্র! তা হলে কি তাঁর সংবাদ শাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে? গাস্‌সান-সম্রাটের কাছেও তাঁর গুরুত্ব আছে? আশ্চর্য! সম্রাটের উদ্দেশ্য কী?

কাআব চিঠিটি খুললেন। দেখলেন তাতে লেখা আছে–

> পরসমাচার, হে কাআব ইবনে মালেক! আমাদের কাছে খবর এসেছে যে, আপনার নেতা আপনার উপর রুষ্ঠ হয়েছেন এবং আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনি ধ্বংস ও অপমানের দেশে থাকার জন্য সৃষ্ট হননি। আমাদের কাছে চলে আসুন, আমরা আপনাকে প্রবোধ দিব।

চিঠি পড়া সম্পন্ন করে কাআব বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। কুফরের লোকজন আমাকে প্রলোভন দিচ্ছে! এ তো আরেক বিপদ।

চিঠি নিয়ে তিনি চুলার কাছে গেলেন। চুলা জ্বালিয়ে চিঠিখানা ভস্ম করে দিলেন তিনি। সম্রাটের প্রলোভনের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

হাঁ, কাআবের জন্য খুলে গেছে সম্রাটদের দুয়ার এবং আমীর-উমরাদের প্রাসাদ তাঁকে সমাদর ও সম্মান করার জন্য আহ্বান করছে; আর চারপাশে মদীনা তাঁকে তিরস্কার করছে। সেখানকার লোকজন তাঁকে ভ্রুকুটি করছে। তিনি সালাম দিলে জওয়াব দেওয়া হয় না। তাঁর জিজ্ঞাসায় কোন সাড়া দেওয়া হয় না। এরপরও তিনি কাফেরদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করলেন না।

শয়তান তাঁকে প্ররোচনা দিতে গিয়ে অথবা প্রবৃত্তির পূজারী বানাতে গিয়ে ব্যর্থ হল। সম্রাটের চিঠি তিনি আগুনে জ্বালিয়ে দিলেন। এভাবে

দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগল। পুরো হয়ে গেল একটি মাস। কাআবের অবস্থায় কোন পরিবর্তন নেই। বয়কটে তার গলা শুকিয়ে গেল এবং সঙ্কট আরও ঘনিভূত হতে লাগল। রসুলও তাঁকে ডাকেন না; ওহী-ও কোন ফয়সালা দেয় না।

যখন চল্লিশ দিন পূর্ণ হল, তখন নবীজীর একজন দূত তাঁর কাছে এলেন। দরজায় কড়া নাড়লেন তিনি। হয়তো তিনি সঙ্কটহ্রাসের কোন সংবাদ নিয়ে এসেছেন– এই আশায় কাআব এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে। কিন্তু দূত বললেন, 'রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রী থেকে দূরে সরে যেতে।'

কাআব বললেন, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব, না কি এর মতলব অন্যকিছু?

দূত বললেন, না; তালাক দিতে হবে না। তবে তার থেকে দূরে থাকবেন এবং তার কাছে ঘেঁসবেন না।

কাআব স্ত্রীর কাছে গেলেন। বললেন, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও এবং এই বিষয়ে কোন ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকো।

কাআবের সঙ্গীদ্বয়ের কাছেও একই খবর পাঠালেন নবীজী। তখন হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী তাঁর কাছে এসে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! হেলাল ইবনে উমাইয়া অত্যন্ত দুর্বল এক বুড়ো মানুষ। আপনি কি আমাকে তাঁর খেদমত করার অনুমতি দিবেন?
রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

হাঁ, অনুমতি দিচ্ছি; তবে তিনি যেন তোমার কাছে না আসেন।

মহিলা বললেন, আল্লাহর কসম! তাঁর তো নড়বার শক্তি নেই। এই ঘটনা ঘটার পর থেকে তিনি সবসময় বিষণ্ন থাকেন এবং রাতদিন শুধু কাঁদেন।

দিনগুলো কাআবের জন্য আরও ভারি হয়ে উঠল এবং বয়কট হয়ে উঠল আরও অসহনীয়। এমন কি তিনি ঈমান নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি মুসলমানদের সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা কথা বলে না।

তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দেন, কিন্তু জওয়াব শোনা যায় না। তা হলে তিনি এখন কোথায় যাবেন; কার নিকট থেকে পরামর্শ নিবেন?

কাআব রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, যখন আমার পরীক্ষা দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন আমি আমার চাচাত ভাই আবু কাতাদার কাছে গেলাম। তিনি আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিত্ব। গিয়ে দেখলাম তিনি তাঁর বাগানে রয়েছেন। আমি দেয়াল টপকে ভিতরে গেলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। আল্লাহর কসম! তিনি আমার সালামের জওয়াব দিলেন না।

আমি বললাম, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি হে আবু কাতাদা! আপনি কি জানেন যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে ভালোবাসি? তিনি চুপ থাকলেন। তখন আমি বললাম, আবু কাতাদা! আমি আপনাকে আল্লাহর নামে কসম দিচ্ছি, আপনি কি জানেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে আমি ভালোবাসি?

তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুল ভালো জানেন।

চাচাত ভাই এবং সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির নিকট থেকে কাআব এমন জওয়াব পেলেন। তিনি জানেন না এখন তিনি মুমিন কি না? তিনি এই জওয়াব সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর চোখ দুটি অশ্রুতে ভেসে গেল। তিনি আবার দেয়াল টপকে বেরিয়ে এলেন। চলে গেলেন নিজ বাড়িতে। বসে গেলেন সেখানে। বাড়ির দেয়ালের দিকে নজর বুলাতে লাগলেন। বাড়িতে স্ত্রী নেই যে পাশে এসে বসবেন। কোন আত্মীয়ও নেই যে প্রবোধ দিবেন। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে তাঁদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে দেওয়ার পর এভাবে গত হয়ে গেল পঞ্চাশ দিন।
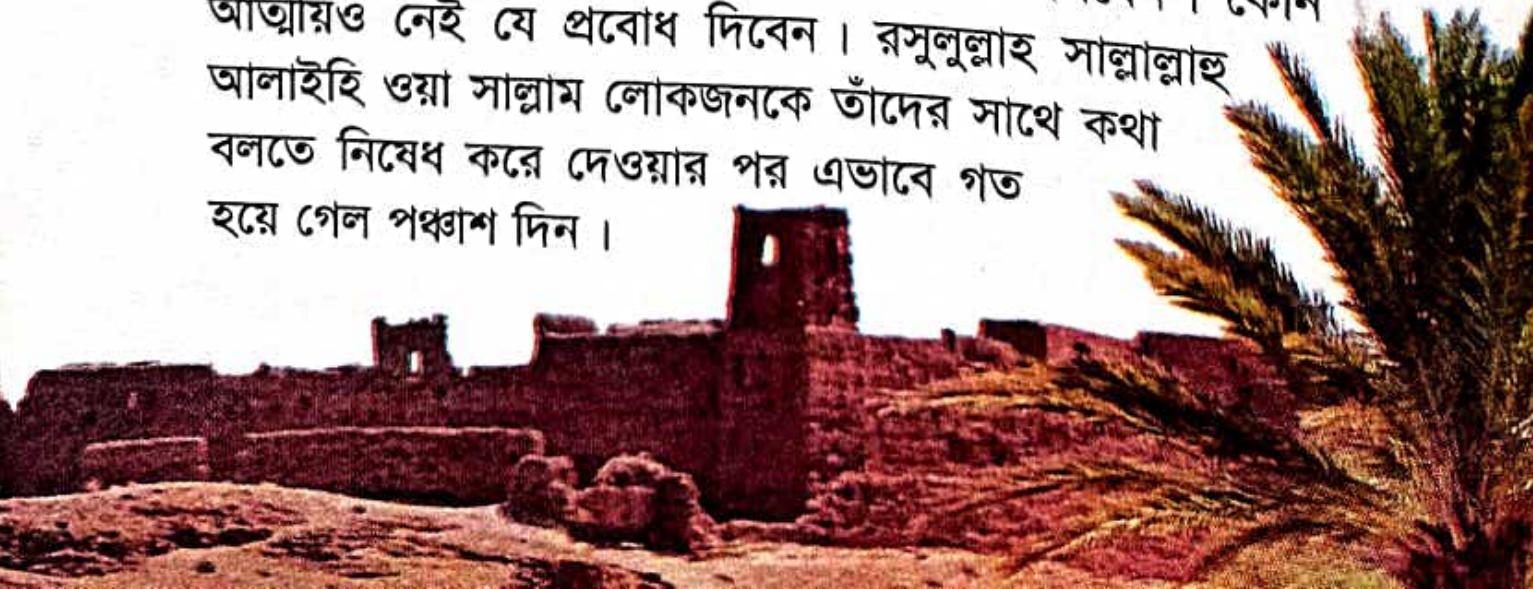
পঞ্চাশতম রাতের তৃতীয় প্রহরে নবীজীর উপর তাদের তওবা কবুলের ঘোষণা নাযিল হল। তখন উম্মে সালামা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা কি কাআবকে সুসংবাদ পাঠাব না? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

তা হলে লোকজন তোমাদের উপর ভেঙে পড়বে। বাকি রাত আর তোমরা ঘুমোতে পারবে না।

তারপর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফজরের নামায পড়লেন, তখন লোকজনের মাঝে তাদের তওবা কবুল হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। লোকজন তাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য চলে গেল।

কাআব বলেন, আমাদের বাড়ির ছাদে আমি ফজরের নামায পড়েছিলাম। তারপর আমি সে অবস্থায়ই বসে ছিলাম, যে অবস্থার কথা আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন। নিজের উপর আমার ঘৃণাবোধ জন্মে গিয়েছিল। জমিনের প্রশস্ততা থাকা সত্ত্বেও তা আমার জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একটি চিন্তায় প্রচণ্ড রকমে আচ্ছন্ন ছিলাম যে, আমি মরে যাব; কিন্তু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জানাযা পড়বেন না; অথবা তিনি মারা যাবেন; কিন্তু আমি এই অবস্থায়ই থেকে যাব– কেউ আমার সাথে কথা বলবে না এবং আমার জানাযাও পড়া হবে না।

আমি এমনই চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। হঠাৎ কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, যা ভেসে আসছিল সালা' পাহাড় থেকে। লোকটি বলছিলেন, হে কাআব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করুন।
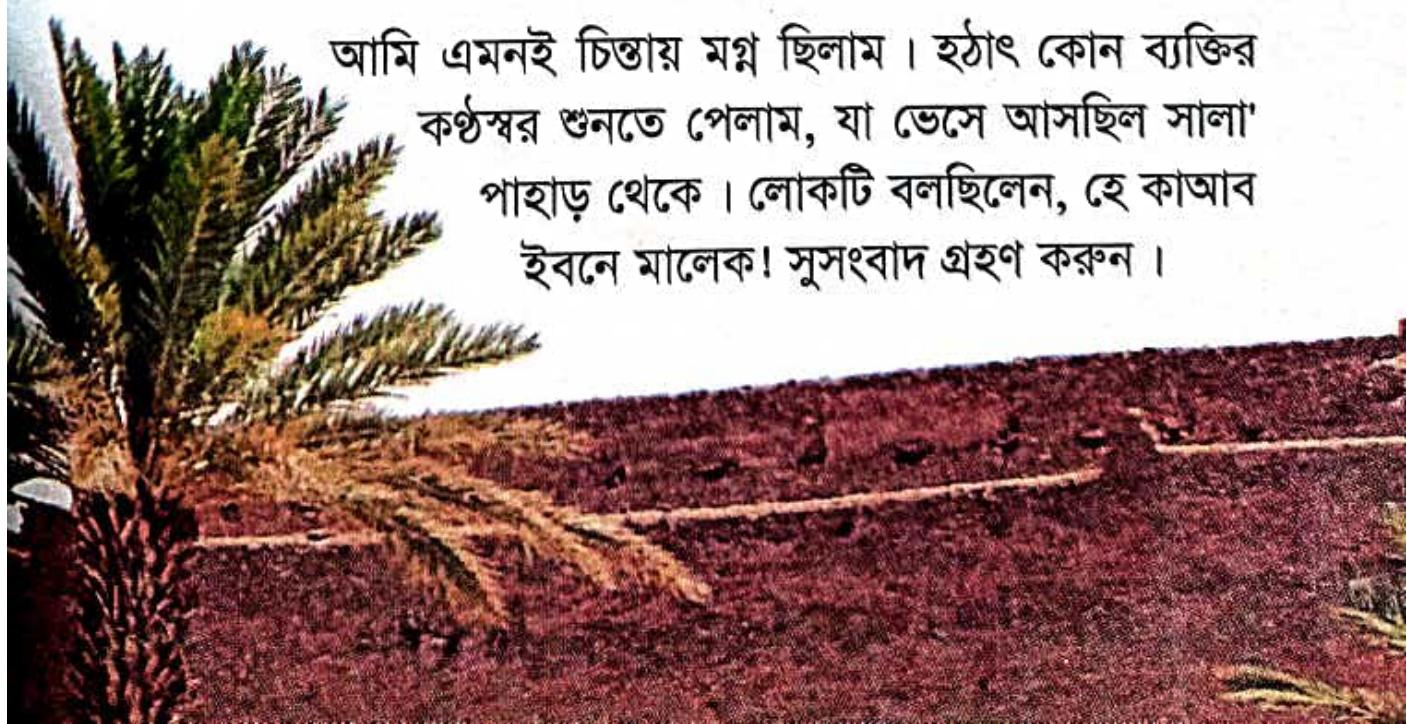
আমি তখনই সেজদায় পড়ে গেলাম। বুঝে নিলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ এসে পড়েছে। ইতোমধ্যে ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে এগিয়ে এলেন একজন। আরেক জন পাহাড়ের চূড়া থেকে চিৎকার দিলেন। ঘোড়ার চেয়ে আওয়াজের গতি ছিল বেশি।

তারপর যার কণ্ঠে আমি সুসংবাদ শুনেছিলাম তিনি যখন আমার কাছে এসে পৌঁছলেন, আমি গায়ের কাপড় দুটি খুলে তার গায়ে জড়িয়ে দিলাম সুসংবাদের পুরস্কার হিসেবে। আল্লাহর কসম! আমার আর কোন কাপড় ছিল না। কাজেই অপর দুটি কাপড় ধার করে এনে পরতে হল। এরপর আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটলাম। দলে দলে লোকজন আমার সাথে দেখা করল এবং তারা তওবা কবুলের সুসংবাদ দিল। তারা বলছিল, আপনার তওবা কবুল হয়েছে, এজন্য অভিনন্দন।

আমি গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। সালাম দিলাম রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। তখন আনন্দে তাঁর চেহারা ঝলমল করছিল। যখন তিনি খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা ঝলমল করে উঠত। একেবারে চাঁদের টুকরোর মত। তিনি আমাকে দেখে বললেন–

তোমার মা তোমাকে জন্ম দেওয়ার পর থেকে আজ সর্বশ্রেষ্ঠ দিনের সুসংবাদ গ্রহণ করো।
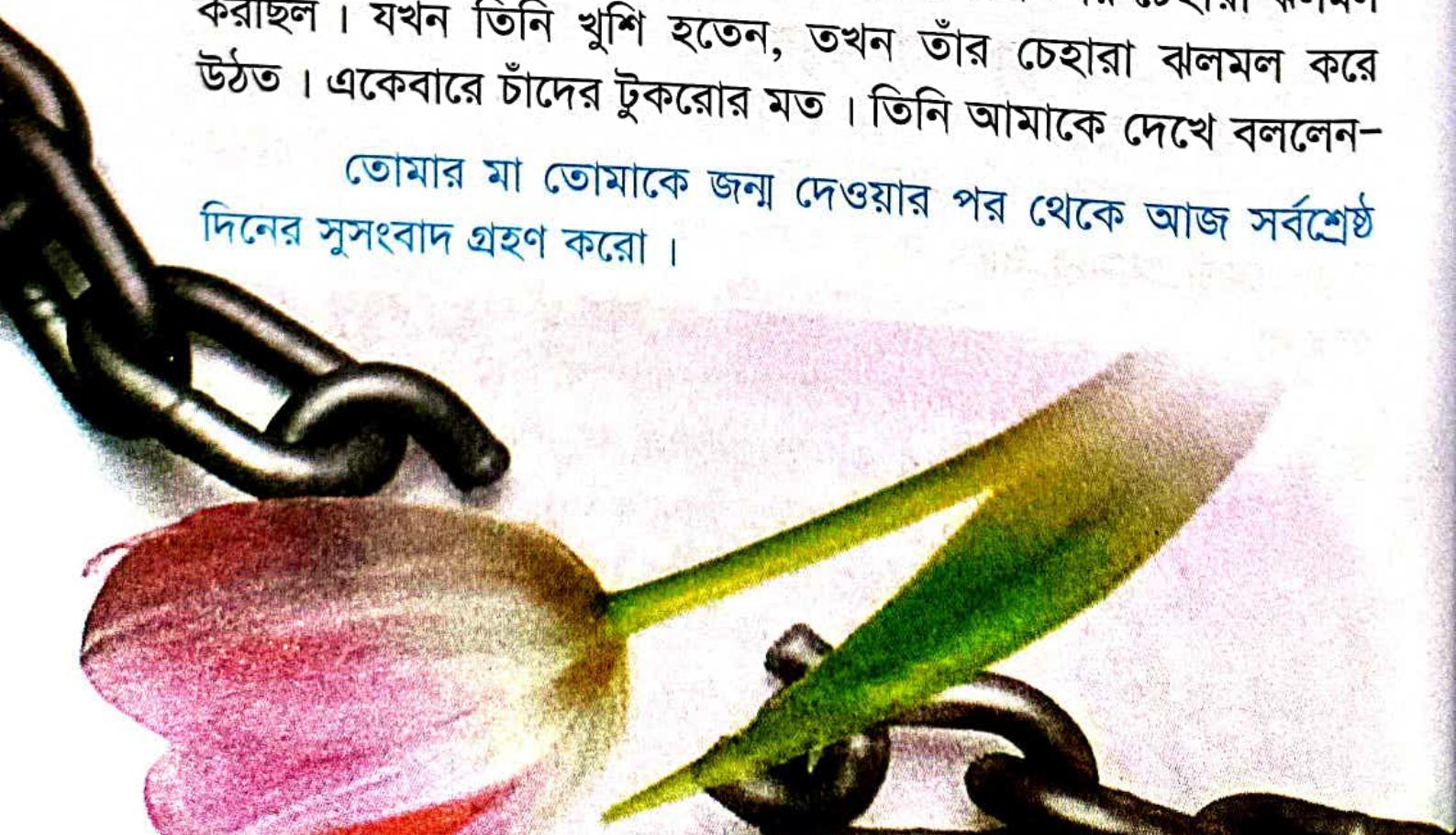
আমি বললাম, আপনার পক্ষ থেকে, না কি আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন–

না: বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে।

তারপর তিনি আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন। আমি তাঁর সামনে বসলাম। বললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া হিসেবে আমার বিষয়-সম্পত্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে প্রদান করে মুক্ত হতে চাই।
তিনি বললেন–

নিজের জন্য কিছু সম্পদ রেখে দাও। এটা তোমার জন্য ভালো হবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল! আল্লাহ আমাকে সত্যের কারণে মুক্তি দিয়েছেন। আমি তওবার অংশ হিসেবেই বাকি জীবনে কখনও সত্য ছাড়ব না।

হাঁ, আল্লাহ কাআব ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের তওবা কবুল করলেন এবং এ প্রসঙ্গে কুরআনের কয়েকটি আয়াত নাযিল করলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

আল্লাহ দয়া করেছেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন সময়ে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের মধ্য থেকে একদলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। আর (তিনি দয়া করেছেন) সেই তিনজনের প্রতি, যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি দয়া করলেন, যেন তারা তওবা করতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ দয়াশীল করুণাময়। *[সুরা তাওবা : ১১৭, ১১৮]*
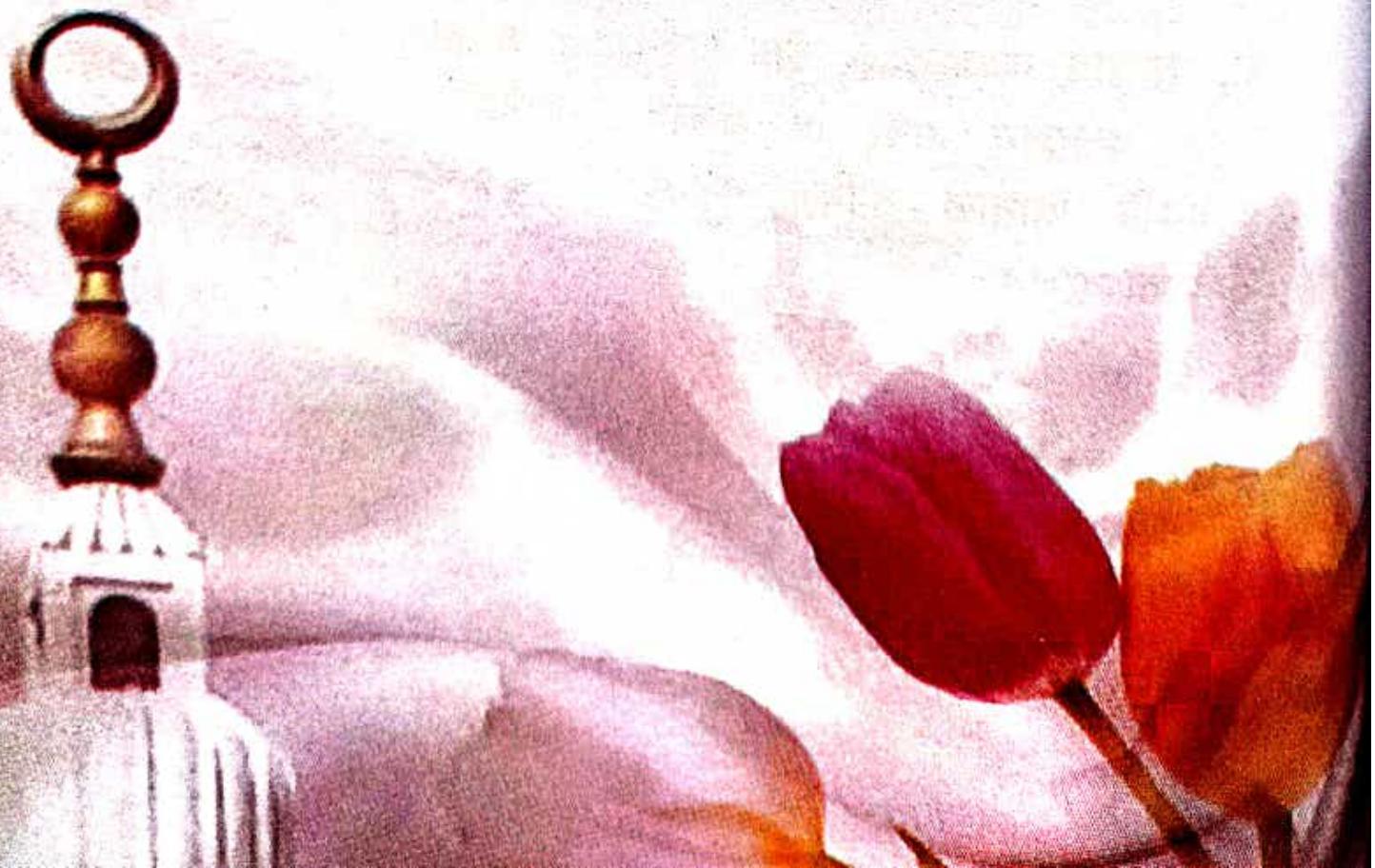
মাছের পেটে

দুনিয়াতে তিন কিসিমের মানুষ আছে। কিছু লোক শুধু মসিবতের সময় আল্লাহকে ডাকে। কিছু লোক আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর ফরমাবর্দারী করে। যখন মসিবত সরে যায়, তখন আল্লাহর না-ফরমানীতে লিপ্ত হয়ে যায়। আর কিছু লোক আছে এমন, যাদের দিনরাত আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর সামনে কাকুতি-মিনতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

এই তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আল্লাহর নবী ইউনুস আলাইহিস সালাম। তিনি তাঁর কওমকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। ঈমানের দাওয়াত দেন। কিন্তু কওমের লোকজন আল্লাহর সত্য দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহঙ্কার প্রদর্শন করে। ইউনুস আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন যে, তাঁর দিবারাত্রির মেহনত কোন ফল দিল না; বরং উল্টো তাঁর কওম বিগড়ে যাচ্ছে এবং অস্বীকার ও গোয়ার্তুমি করছে, তখন তিনি কওমের উপর নারাজ হয়ে তাদেরকে ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাগান্বিত হয়ে তিনি নিজ জনপদ থেকে বের হলেন। গিয়ে উপস্থিত হলেন সাগরপাড়ে। একটি নৌকায় চড়ে বসলেন। নৌকা মধ্যসাগরে পৌছনোর পর শুরু হল তুফান। নৌকা ঢুলতে লাগল। দেখা দিল নৌকা ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা, শেষে সব আরোহীর সলিলসমাধি হয় কি না। আরোহীরা সিদ্ধান্ত নিলেন নৌকার ওজন কমাতে হবে। একজন ত্যাগ স্বীকার করে সাগরে ঝাঁপ দিলে অন্যদের প্রাণ বেঁচে যাবে।

আরোহীরা বাজি দিল। বেরিয়ে এল ইউনুস আলাইহিস সালামের নাম। কিন্তু কেউ তাঁকে সাগরে ফেলতে রাজি হল না। আবার বাজি দেওয়া হল; বার বার বাজি দেওয়া হল; কিন্তু প্রত্যেক বার ইউনুস আলাইহিস সালামের নামই বের হতে থাকল। সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হল ইউনুস আলাইহিস সালামকে। সাগরে ঝাঁপ দেওয়ার সাথে সাথে একটি মাছ এসে তাঁকে গিলে ফেলল এবং তাঁকে পেটে নিয়ে চলে গেল গভীর সাগরের নীচে।

এগুলো সব আকস্মিক ও দ্রুত ঘটে গেল। চোখের পলকে ইউনুস আলাইহিস সালাম গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। আশপাশের বিভিন্ন বস্তু পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন তিনি। দেখলেন, গভীর সাগরের তলে পাথর-কঙ্কর আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। নিজের ত্রুটির অনুভূতি ইউনুস আলাইহিস সালামকে খুব পীড়া দিতে লাগল। কেননা, তিনি তাঁর রবের হুকুম না নিয়েই কওম ও জনপদ ছেড়ে এসেছেন। তিনি আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন–

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ [الأنبياء : ٨٧]

তারপর সে (সাগরের) অন্ধকারের মধ্যে ডেকে উঠলেন, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমিই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত। *[সুরা আম্বিয়া : ৮৭]*

ইউনুস আলাইহিস সালামের এই আহ্বান সোজা আল্লাহর আরশে গিয়ে লাগল। আল্লাহ তাআলা বান্দার ডাকে সাড়া দিলেন এবং তাঁকে মসিবত থেকে মুক্তি দিলেন।

এ তো নবী ইউনুস আলাইহিস সালামের ঘটনা। কিন্তু আজকের ইউনুস অন্যজন। চলুন, শুনি তিনি কী বলেন!

আমি যৌবনের নেশায় মত্ত ছিলাম। জীবন বলতে বুঝতাম অঢেল সম্পদ, নরম বিছানা, দ্রুতগামী যানবাহন আর আলীশান বাড়ি। সেদিন ছিল শুক্রবার। বন্ধ-বান্ধবের সাথে সাগরপাড়ে বসে ঢেউ দেখছিলাম আর মৌজ করছিলাম। সবাই ছিলাম আল্লাহভোলা। দুনিয়ার আনন্দ-ফূর্তিই ছিল আমাদের দৃষ্টিতে সবকিছু। ঠান্ডা বাতাস বইছিল। প্রকৃতি ছিল নীরব। আচানক বাতাসের গতি কিছুটা বেড়ে আমাদের আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। ইতোমধ্যে মসজিদ থেকে আওয়াজ ভেসে এল–

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ... حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ...
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ... حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ...

আসো নামাযের দিকে; আসো নামাযের দিকে।
আসো সাফল্যের দিকে; আসো সাফল্যের দিকে।
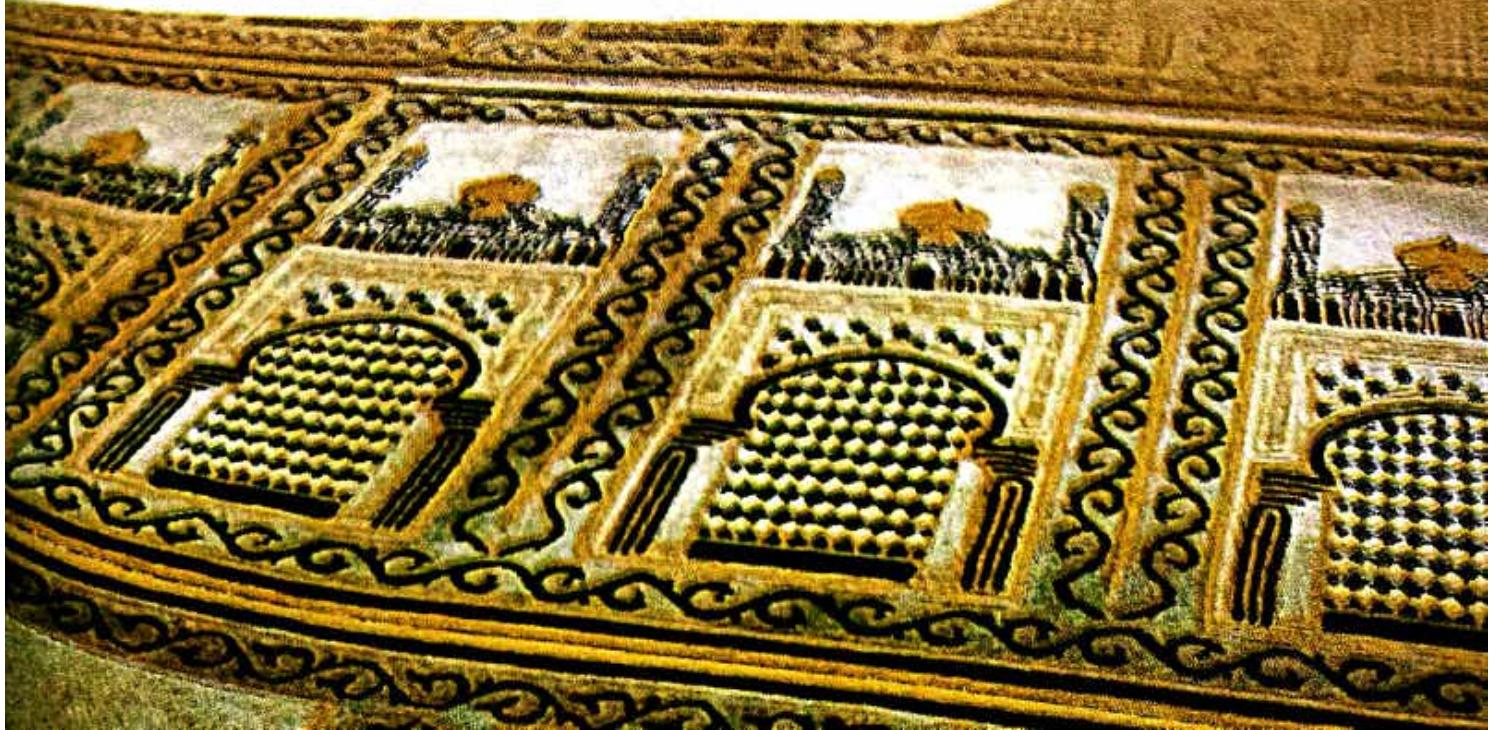
আল্লাহর কসম! অনেক দিন থেকে আযান শুনতাম; কিন্তু আমি একদিনও সাফল্যের বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে ভাবিনি। আমার দিল পুরোপুরি শয়তান আয়ত্ত করে নিয়েছিল। আমি আযানের শব্দমালা শুনেও শুনলাম না। সাগরপাড়ের লোকজন জায়নামায নিয়ে একত্র হতে লাগল; অথচ আমরা অক্সিজেন-সিলিন্ডার বেঁধে সাগরে ডুব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলাম।

ডুবুরির পোশাক পরে সাগরে নেমে পড়লাম আমরা। পাড় থেকে দূরে যেতে থাকলাম। চলে গেলাম একেবারে মধ্য সাগরে। তখন আমাদের সবাই যার যার ধ্যানে মগ্ন। প্রতি মুহূর্তে আমাদের আনন্দ-ফূর্তি বাড়ছিল। ডুবুরি মুখে একটি রাবারের টিউব লাগিয়ে থাকে, যাতে মুখে পানি না ঢোকে এবং নলের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করা যায়। আমার মুখে লাগানো সেই টিউব আচানক ফেটে গেল।

উক্ত টিউব ফাটার সাথে সাথে সাগরের লোনা পানি আমার ফুঁসফুঁসে চলে গেল। আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হতে লাগল। ঘনিয়ে আসতে লাগল মৃত্যুর সময়। আমার ফুঁসফুঁস কাঁপতে লাগল। ওখানে তীব্র প্রয়োজন ছিল বাতাসের। আমি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। সাগরের অন্ধকার আমাকে বেচাইন করে তুলছিল। বন্ধুরা সব ছিল দূরে। অবস্থার জটিলতা অনুভূত হতে থাকল। ক্রমাগত ডুবে যেতে লাগলাম। দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এ যাত্রায় আর বাঁচা গেল না।

আমি চিৎকার দিয়ে কাউকে ডাকতে চেষ্টা করলাম। জীবনের ফিল্ম আমার সামনে ঘুরতে শুরু করল। আমি কতটা দুর্বল, সে কথা হাড়ে হাড়ে টের পেতে থাকলাম। আমি অসহায়। আল্লাহ তাআলা কয়েক ফোঁটা লোনা পানি ঢুকিয়ে দিয়ে পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে, সমস্ত শক্তি ও কুদরতের মালিক তিনিই। একীন হয়ে গেল যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই।

সাগরের তলা থেকে উঠে আসার জন্য আমি খুব জোরে চেষ্টা করছিলাম; কিন্তু অনেক দূরে গিয়েছিলাম এবং মৃত্যু আমাকে হাতছানি দিচ্ছিল।

মৃত্যুর ভয় খুব একটা ছিল না; একটি অনুভব আমাকে অস্থির করে ফেলছিল যে, আমি মহাপরাক্রমশালী খালেক ও মালেক আল্লাহর সামনে কোন্ মুখ নিয়ে উঠব। আমি আল্লাহর সাক্ষাতে যাওয়ার জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। যদি তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি তো তোমাকে জীবন দিয়েছিলাম, তুমি এখন কী কৃতীত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছ? তোমাকে ধন-দৌলত দিয়েছিলাম, সেগুলো কোথায় খরচ করেছ?

আমি সবসময় নামাযে গাফেল ছিলাম। আমার রব সবার নামাযের ব্যাপারেই জবাবদিহি তলব করবেন। আমি কী জওয়াব দিব? আচানক আমার কালেমায়ে শাহাদত মনে পড়ে গেল। আমি চাইছিলাম, কালেমা পড়তে পড়তে আমার মৃত্যু হোক; কিন্তু কেবলই আমি 'আশ্হা' পর্যন্ত বলেছি, সাথে সাথে আমার কণ্ঠনালী লোনা পানিতে ভরে গেল। মনে হল, অদৃশ্য কেউ আমার গলা চেপে ধরল, যাতে আমি কালেমা বলতে না পারি।

আমার দিল বলতে লাগল, হে আমার পরওয়ারদেগার! একটু সুযোগ দাও। হে আল্লাহ! কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাকে স্থলে পৌঁছে দাও। কিন্তু বাঁচবার কোন পন্থা নজরে পড়ছিল না।

সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। সাগরের ভয়াল অন্ধকার আমাকে নিরাশ করে দিয়েছিল। কিন্তু আমার রবের রহমতের তো কোন অন্ত নেই। আচানক আমার বুকের মধ্যে হাওয়া প্রবেশ করতে লাগল।

অন্ধকার সরে গেল। চোখ খুলে গেল। দেখলাম, আমার এক সাথি আমার মুখে পাম্পার লাগিয়ে দিয়েছেন। আমার পুরোপুরি সম্বিত ফিরে আনার জন্য চেষ্টা করছিলেন তিনি। আমি তাঁর চোখে আনন্দের ঝিলিক দেখে বুঝতে পারলাম এখন আমি শঙ্কামুক্ত। তখন আমার দিল, আমার যবান এবং আমার দেহের প্রতিটি লোমকূপ বলে উঠল–

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ... وَالْحَمْدُ لِلّهِ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসুল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

অসংখ্য শুকর সেই সত্তার জন্য, যিনি আমাকে সেই মসিবত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। পানি থেকে বের হওয়ার পর আমি আর আগের ইউনুস নই। আমার জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে।

দিনদিন আল্লাহ তাআলার সাথে আমার নৈকট্য লাভ হতে থাকে। আমি জীবনের মাকসাদ পেয়ে ফেলেছি। আমার মানসপটে এখন সবসময় আল্লাহর এই বাণী ঝলমল করতে থাকে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات : ٥٦]

আর আমি জিন ও ইনসানকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার এবাদত করবে। *[সুরা যারিয়াত : ৫৬]*

এটি একটি সুদৃঢ় সত্য। তিনি আমাদেরকে বেকার ও বে-মাকসাদ সৃষ্টি করেননি। কয়েকদিন পর আমার ডুবে যাওয়ার ঘটনা আবার মনে পড়ল। আমি সাগরের দিকে গেলাম। ডুবুরির পোশাক পরিধান করে পানিতে ঝাঁপ দিলাম। সাগরের মধ্যে সেখানেই চলে গেলাম, যেখানে আমি দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে আমি আল্লাহকে সেজদা করলাম। আমার মনে পড়ে না যে, আমি পরওয়ারদেগারকে স্মরণ করে কখনও এমন গভীর মনোযোগের সাথে সেজদা করেছি। আমি সেখানেই সেজদা করেছি, যেখানে আমার আগে আর কেউ সেজদা করেছে বলে মনে হয় না। আশা করি, সেই জায়গা কিয়ামতের দিন আমার সেজদার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে। উক্ত সেজদার কারণে আমার আল্লাহ আমার প্রতি দয়া করবেন এবং আমাকে জান্নাতে জায়গা দিবেন। আমীন।

আমাদের রব আমাদের মা-বাবার চেয়েও অধিক দয়ালু। এটাও তাঁরই রহমত যে, তিনি প্রত্যেক ফাসেক ও ফাজের, কাফের ও মুশরিকের জন্য তওবার দরজা খুলে রেখেছেন। তাঁর রহমতের বৃষ্টি প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই পতিত হয়। তওবার দরজা যেকোন ব্যক্তির জন্য যেকোন সময় খোলা।

একজন বুড়ো লোকের দিকে লক্ষ করুন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর কোমর বাঁকা হয়ে গেছে। ঢুলতে ঢুলতে এবং পা হিঁচড়ে হিঁচড়ে কোন রকমে তিনি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে উপস্থিত হলেন।
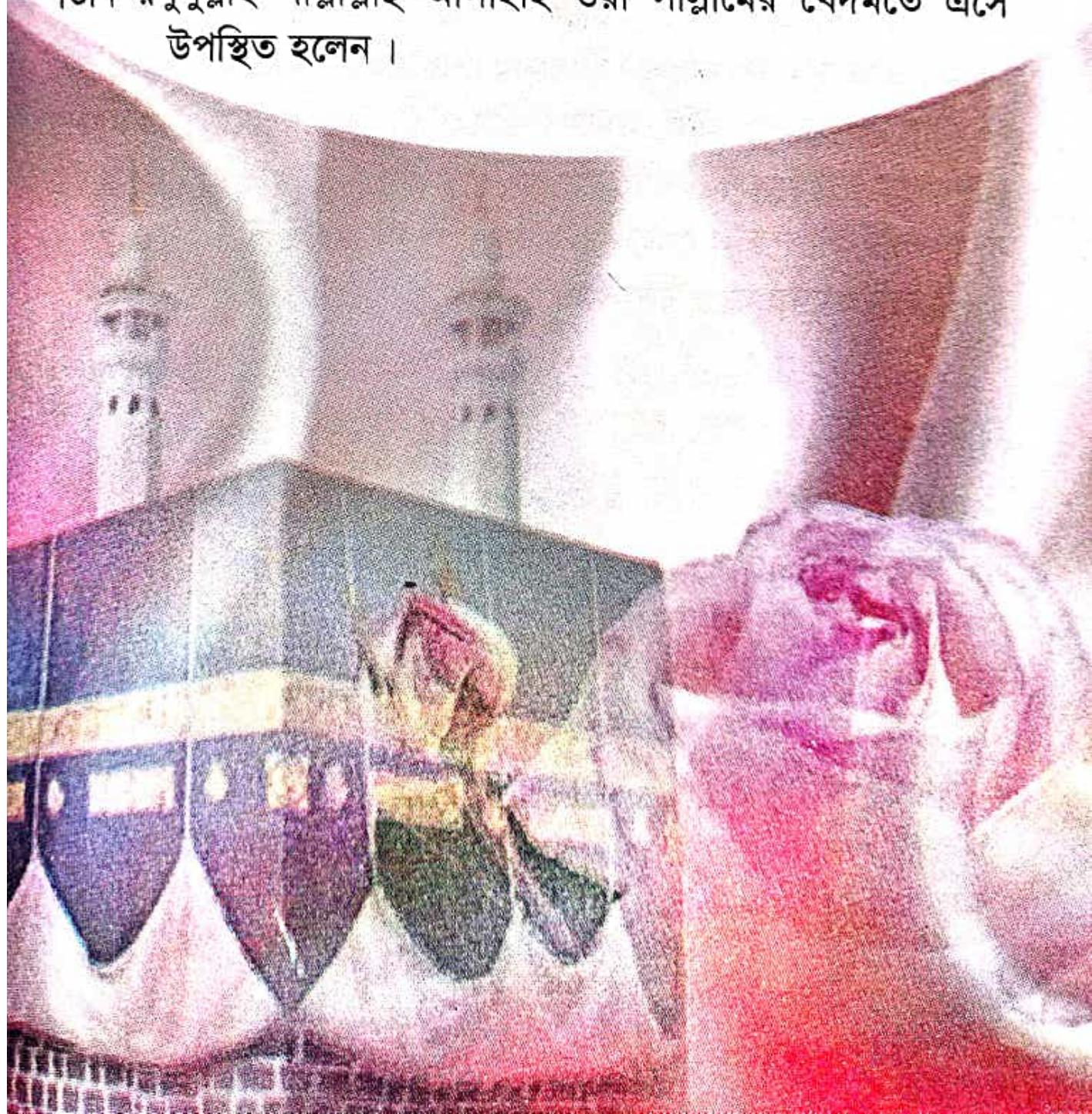
সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে বসে ছিলেন নবীজী। বৃদ্ধ লোকটির ভ্রু চোখের উপর নুয়ে পড়েছে। লাঠিতে ভর করে পা টেনে টেনে নবীজীর কাছেই এসে পড়লেন তিনি। একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন। ক্ষীণ আওয়াজে বললেন, এমন লোকের ব্যাপারে বলুন, যে তার সারাটি জীবন গুনাহের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছে। কোন গুনাহ সে বাদ রাখেনি। ছোট-বড় সব ধরণের গুনাহে সে লিপ্ত হয়েছে। যদি তার গুনাহ জমীনে বসবাসকারী সমস্ত মানুষকে ভাগ করে দেওয়া হয়, তা হলে সবাইকে ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করবে। এমন ব্যক্তির জন্য কি তওবার সুযোগ আছে?

রহমতের নবী চোখ তুলে তাকে দেখলেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর কোমর ভাঁজ হয়ে গিয়েছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত গুনছিলেন তিনি। যুগ ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা তাঁকে ঝাঁকুনি দিয়েছে। স্বেচ্ছাচার জীবন তাঁকে ধ্বংস করে দিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম কবুল করেছ?

বৃদ্ধ কালবিলম্ব না করে বললেন–

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ.

নবীজী বললেন, আচ্ছা; যাও। নেক কাজ করো; গুনাহ ছেড়ে দাও। আল্লাহ তোমার গুনাহসমূহ নেকী দ্বারা বদলে দিবেন।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাআলা কি আমার সমস্ত গুনাহ আর অপরাধ মাফ করে দিবেন?

নবীজী বললেন, হাঁ।

বৃদ্ধ চিৎকার দিয়ে উঠলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

তাকবীর বলতে বলতে তিনি ফিরে যেতে থাকলেন এবং একসময় সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে গেলেন।

আল্লাহ মায়ের চেয়েও বেশি দয়ালু

আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনে খাত্তাব বর্ণনা করেন যে, এক লড়াইয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে কিছু কয়েদী আনা হল। তাদের মধ্যে একজন নারীও ছিলেন। তার অবস্থা ছিল আজব ধরণের।

কয়েদীদের মধ্যে কোন শিশু পেলেই সে তাকে কোলে নিত এবং নিজের বুকের সাথে ধরে দুধ পান করাত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানের জন্য উক্ত মহিলার এমন অস্থিরতা অবলোকন করে সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা কি মনে কর, এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, কক্ষণও নয়। এ তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারবে না।
নবীজী বললেন–

لَلّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا.

মনে রেখো, মহিলা সন্তানের উপর যতটা মেহেরবান, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর এর চেয়ে অনেক বেশি মেহেরবান।

হাসপাতালে

আমি [ড. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী] একবার এক হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানে এক রোগীর পাশ দিয়ে অতিবাহিত হলাম। তার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশ। লোকটি দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, সুঠাম দেহ ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারা। লোকটির পুরো দেহ ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত; তাতে কোন অনুভূতি ছিল না। একটুও নড়ার ক্ষমতা ছিল না তার। শুধু মাথা ও ঘাড় কিছুটা নাড়তে পারতেন।

আপনি যদি কুঠার দিয়ে তার দেহ ফালিফালি করে দেন, তবুও তার উপলব্ধি করার মত ক্ষমতা ছিল না। একেবারে নিথর হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন তিনি। প্রস্রাব-পায়খানার অনুভূতিও তার ছিল না। যখন তার থেকে গন্ধ ছোটে, তখন তার দেখাশোনাকারী কাপড় বদলে দেন। আমি তার কামরায় প্রবেশ করলে টেলিফোন বেজে উঠল। তিনি চেঁচিয়ে আমাকে আওয়াজ দিলেন। বললেন, জনাব! ফোনটা একটু ধরুন। তা না হলে বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি রিসিভার উঠিয়ে তার কানে লাগিয়ে দিলাম। তিনি কথা বলতে লাগলেন। আমি ওখানেই দাঁড়ালাম। লোকটি কথা শেষ করে বললেন, জনাব! রিসিভারটা ওখানে রেখে দিন।

আমি রিসিভার নিয়ে রেখে দিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কতদিন থেকে এভাবে আক্রান্ত আছেন?

তিনি বললেন, বিশ বছর থেকে এভাবে আক্রান্ত আছি।

একবার এক বন্ধু আমাকে বললেন, আমি এক হাসপাতালে একটি কামরার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলাম। কামরা থেকে বিস্ময়কর আওয়াজ আসছিল। কামরার ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, এক রোগী খুব জোরে জোরে চিৎকার করছে। তার আওয়াজ এত ভয়ঙ্কর ছিল যে, শুনলে কলজে ফেটে যাবে।

বন্ধু বলেন, আমি তার কাছে গেলাম। পক্ষাঘাতের কারণে লোকটির দেহে কোন অনুভূতি ছিল না। সে এদিক ওদিক দেখতে চেষ্টা করত; কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়ে যেত। আমার খুব দুঃখ লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই রোগী এভাবে চিৎকার করছে কেন? নার্স আমাকে বললেন, পক্ষাঘাতের কারণে এর পুরো দেহ অনুভূতিশূন্য হয়ে গেছে। তা ছাড়া এর অন্ত্রের মধ্যেও সমস্যা আছে। কোন জিনিস খেলেই তার এই সমস্যা হয়। কোন খাবার এ হজম করতে পারে না।
আমি বললাম, আপনারা একে কখনই শক্ত খাবার দিবেন না। গোশ্‌ত অথবা ভাত কাছে আনতে দিবেন না।

নার্স বললেন, আমরা একে শুধু দুধ পান করিয়ে থাকি। তা-ও মুখে নয়; বরং নলের সাহায্যে নাকের ভিতর দিয়ে পেটে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু সেটাও হজম করতে গিয়ে এর এমন দুর্ভোগে পড়তে হয়।
আরেক বন্ধু বলেছেন, তিনি এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। তার কোন নড়াচড়া ছিল না। ব্যথার কারণে চিৎকার করছিলেন লোকটি।

বন্ধু বলেন, আমি তার কাছে গেলাম। সামনে রেহালে কুরআন শরীফ খোলা ছিল। আমি দেখলাম, লোকটি দুই পৃষ্ঠা পড়েন। তারপর আবার সেই দুই পৃষ্ঠা পড়েন। মাঝে এতটুকু বিরতিও দেন না যে, পাতা ওল্টাবেন। তার কাছে সাহায্য করার কেউ ছিল না। যখন আমি তাঁর কাছে দাঁড়ালাম, তখন তিনি অনুরোধ করে বললেন, জনাব! একটু পাতা উল্টিয়ে দিন। আমি কুরআন শরীফের পাতা উল্টিয়ে দিলাম। তার চেহারা ঝলমলিয়ে উঠল। কুরআন মাজীদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পড়তে লাগলেন তিনি। আমি তাঁর সামনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। আমি তাজ্জব হচ্ছিলাম যে, লোকটি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত; কিন্তু কুরআন পাঠের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ঠাঁসা। পক্ষান্তরে আমরা সুস্থ, সুঠাম; ষাড়ের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ কুরআন করীম তেলাওয়াত থেকে এতটাই গাফেল যে, ভুলেও কুরআন পড়ার কথা মনে পড়ে না।

আমার আরেক বন্ধু আবদুল্লাহ বয়ান করেছেন যে, তিনি কোন একটি হাসপাতালে এক লোকের কাছে গিয়েছিলেন। তারও সারা দেহ ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং শুধু মাথাই নাড়তে পারতেন। বন্ধু তার এই অবস্থা দেখে তার প্রতি মমতা অনুভব করেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার কি কোন জিনিসের খায়েশ আছে?

আবদুল্লাহ বলেন, আমার ধারণা ছিল যে, তিনি খাহেশ প্রকাশ করে বলবেন, যদি সুস্থ হয়ে যেতাম; আবার স্ত্রী-সন্তানের হাসি-খুশি, খানা-পিনায় শরীক হতে পারতাম! কিন্তু তিনি তা বললেন না; তিনি বললেন, আমার বয়স প্রায় চল্লিশ। আমার পাঁচ জন সন্তান আছে। সাত বছর থেকে বিছানায় শুয়ে আছি। আল্লাহর কসম! আমার কখনও খাহেশ জাগেনি যে, সন্তানাদিকে দেখব; তাদের সাথে উঠব, বসব; জীবনের স্বাদ নিব।

আমি তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে কী খাহেশ আছে? তিনি বললেন, আমার মন চায়, যদি আমি কপাল মাটিতে ঠেকাতে পারতাম! যদি আমার রবের সামনে আনুগত্যের মাথা নত করতে পারতাম! সেজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে মালিককে নিজের দুঃখের কথা বলতে পারতাম!

[ড. আরিফী বলেন,] এক ডাক্তার নিজে বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমি এক রোগী দেখছিলাম। সেখানে এক বুড়ো মানুষ বেডে শুয়ে ছিলেন। তার গায়ের রং ফর্সা। চেহারা ঝলমলে, কেমন যেন নুরের টুকরো।

চিকিৎসক বলেন, আমি তার ফাইল খুললাম। দেখলাম, তাঁর হৃদযন্ত্রের অপারেশান হয়েছে এবং সাথে সাথে তার ব্লাডপ্রেসার কমে গেছে। ফলে মস্তিষ্কের কিছু শিরায় রক্ত পৌঁছতে পারছে না।

তিনি নিবিড় পরিচর্যায় ছিলেন। তার চার পাশে বড় বড় মেশিন লাগানো ছিল। অক্সিজেন দিয়ে তার কৃত্রিম শ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিনি তখন মিনিটে নয় বার শ্বাস নিচ্ছিলেন। তাঁর পাশে বসে ছিলেন, তাঁর এক ছেলে। আমি ছেলেকে বৃদ্ধ লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, এই বুযুর্গ কে?

তিনি বললেন, ইনি আমার পিতা।

আমি বললাম, তার চেহারা খুব উজ্জ্বল। নিশ্চয় তিনি বড় বুযুর্গ।

ছেলেটি বললেন, দীর্ঘ দিন থেকে তিনি এক মসজিদের মুয়াজ্জিন।

আমি বুড়ো রোগীর দিকে লক্ষ করলাম। আচানক তার হাত নড়ে উঠল এবং চোখ খুলে গেল। আমি তাঁর সাথে কথা বলতে চাইলাম; কিন্তু আমার চেষ্টা ব্যর্থ হল। তাঁর অবস্থা ছিল আশঙ্কাপূর্ণ। তাঁর ছেলে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি সে কথা বুঝলেন না। ছেলে বলছিলেন, আব্বু! মা ও বোনেরা সবাই ভালো আছে। মামা সফর থেকে ফিরে এসেছেন। ছেলে এভাবে বলে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বৃদ্ধের অবস্থার কোন পরিবর্তন হচ্ছিল না। কোন নড়াচড়া বোঝা যাচ্ছিল না। শ্বাস সরবরাহকারী যন্ত্র বরাবর মিনিটে নয় বারই শ্বাস সরবরাহ করছিল।

হঠাৎ করে বৃদ্ধের ছেলে বললেন, আব্বু! উঠুন। মসজিদ আপনার জন্য চেয়ে আছে। অমুক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ আযান দেয় না। আবার সেও যে আযান দেয়, তাতে অসংখ্য ভুল। মসজিদে আপনার জায়গা খালি রয়েছে।

লক্ষ করলাম, মসজিদ ও আযানের কথা বলতেই বৃদ্ধের হৃদকম্পন বেড়ে গেল। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত চলতে লাগল। আমি অক্সিজেন মেশিনের দিকে দেখলাম। সেটা মিনিটে আঠারো বার শ্বাসের রিপোর্ট দিচ্ছিল। ছেলে বিষয়টি লক্ষ করেননি।

ছেলে আবার বলতে লাগলেন, আমার চাচাত ভাইয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।...

ভিন্ন প্রসঙ্গ আসার সাথে সাথে বৃদ্ধের শ্বাস-প্রশ্বাস আবার সাবেকে নেমে গেল। এই অবস্থা দেখে আমি তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করলাম। তাঁর মাথার কাছে দাঁড়ালাম। তাঁর হাত নাড়ালাম। তিনি চোখ খুললেন; কিন্তু কোন আশার আলো দেখা গেল না। সবকিছু নিস্তব্ধ। আমি বিস্মিত হলাম।

নিজের মুখ তাঁর কানের কাছে নিয়ে বললাম, আল্লাহু আকবার... হাইয়া আলাস্ সালাহ... হাইয়া আলাল ফালাহ। অন্যদিকে কানিচোখে অক্সিজেন মেশিনের দিকে খেয়াল করলাম। দেখলাম, শ্বাস তীব্র হয়ে গেছে। মিনিটে আঠারো বার শ্বাসের রিপোর্ট দেখানো হচ্ছে।

সুবহানাল্লাহ! এঁরা কেমন রোগী! আল্লাহর কসম! এঁরা রোগী নন; রোগী হলাম আমরা। এঁদের দিল সবসময় মসজিদের সাথে যুক্ত থাকে। এঁদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে এই আয়াতে–

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ [النور : ٣٧ ، ٣٨]

তারা এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচাকেনা আল্লাহর যিকির, নামায কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে গাফেল করে না। তারা সেই দিনকে ভয় করে, যেদিন অনেক অন্তর ও চোখ ওলট-পালট হয়ে যাবে। (তারা এই কাজ এজন্য করে যে,) যাতে আল্লাহ তাদের আমলসমূহের উত্তম প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে অতিরিক্ত দেন। আল্লাহ যাকে চান, তাকে বেহিসাব রিযিক দিয়ে থাকেন *[সুরা নুর : ৩৭, ৩৮]*

কিন্তু হে রোগ ও পেরেশানীমুক্ত সুস্থ ইনসান! সুখ-সাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপনকারী আল্লাহর ভয় থেকে গাফেল! তোমার উপর আল্লাহর নেয়ামতের তো কোন সংখ্যাশুমার নেই; কিন্তু বিনিময়ে সবসময় আল্লাহর না-ফরমানী করে যাচ্ছ। তোমার বুঝ কবে হবে? সাবধান হও। এখনও সুযোগ আছে। মেহেরবান খোদার এনাম তোমার উপর অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে। রব্বে যুলজালালের বখশিশের হাত কখনও ক্লান্ত হয় না।

তোমার কি ভয় হয় না যে, আগামী কাল হাশরের ময়দানে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়িয়ে লা-শরীক আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে? বিভিন্ন নেয়ামতের হিসাব দিতে হবে? বলো, সেই সময় তুমি কী জওয়াব দিবে, যখন তিনি তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন, হে আমার বান্দা! আমি কি তোমাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার নেয়ামত দিয়েছিলাম না?

আমি কি তোমাকে রিযিক সরবরাহ করিনি? আমি কি তোমাকে সুস্থ কান দিয়েছিলাম না? তুমি তখন বলবে, হে আল্লাহ! হাঁ, তুমি অবশ্যই আমাকে এসব নেয়ামত দিয়েছিলে।

তখন জাব্বার ও কাহ্হার সর্বশক্তিমান তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি আমার নেয়ামতের মোকাবেলায় কেন না-ফরমানী করছিলে এবং আমার শাস্তি ও প্রতিশোধ থেকে নির্ভীক হয়ে কেন গুনাহে ডুবে ছিলে?

তখন সব পর্দা ছিঁড়ে যাবে। সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। তোমার সমস্ত দোষত্রুটি সমস্ত মাখলুকের সামনে প্রকাশ পেয়ে যাবে। তোমার চোখের সামনে গুনাহখাতা মেলে ধরা হবে। গুনাহের পরিণতি যে কত দুঃখজনক!

একটি ছোট্ট গুনাহের কারণে আমাদের পিতা আদমকে জান্নাত থেকে বের দেওয়া হয়েছে। নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে গুনাহের কারণেই। গুনাহই হালাক করে দিয়েছে কওমে আদ ও সামূদকে। কওমে লূতের জনপদ উল্টে দিয়েছিল গুনাহ। শুআইবের কওমের উপর আযাব এসেছিল গুনাহের কারণে। ফেরাউন ও সম্প্রদায়ের উপর ভয়াবহ আযাব নাযিল হয়েছিল। আব্রাহার উপর ক্ষুদে পাথরের বর্ষণ হয়েছিল– এগুলোর কারণও ছিল গুনাহের জীবন।
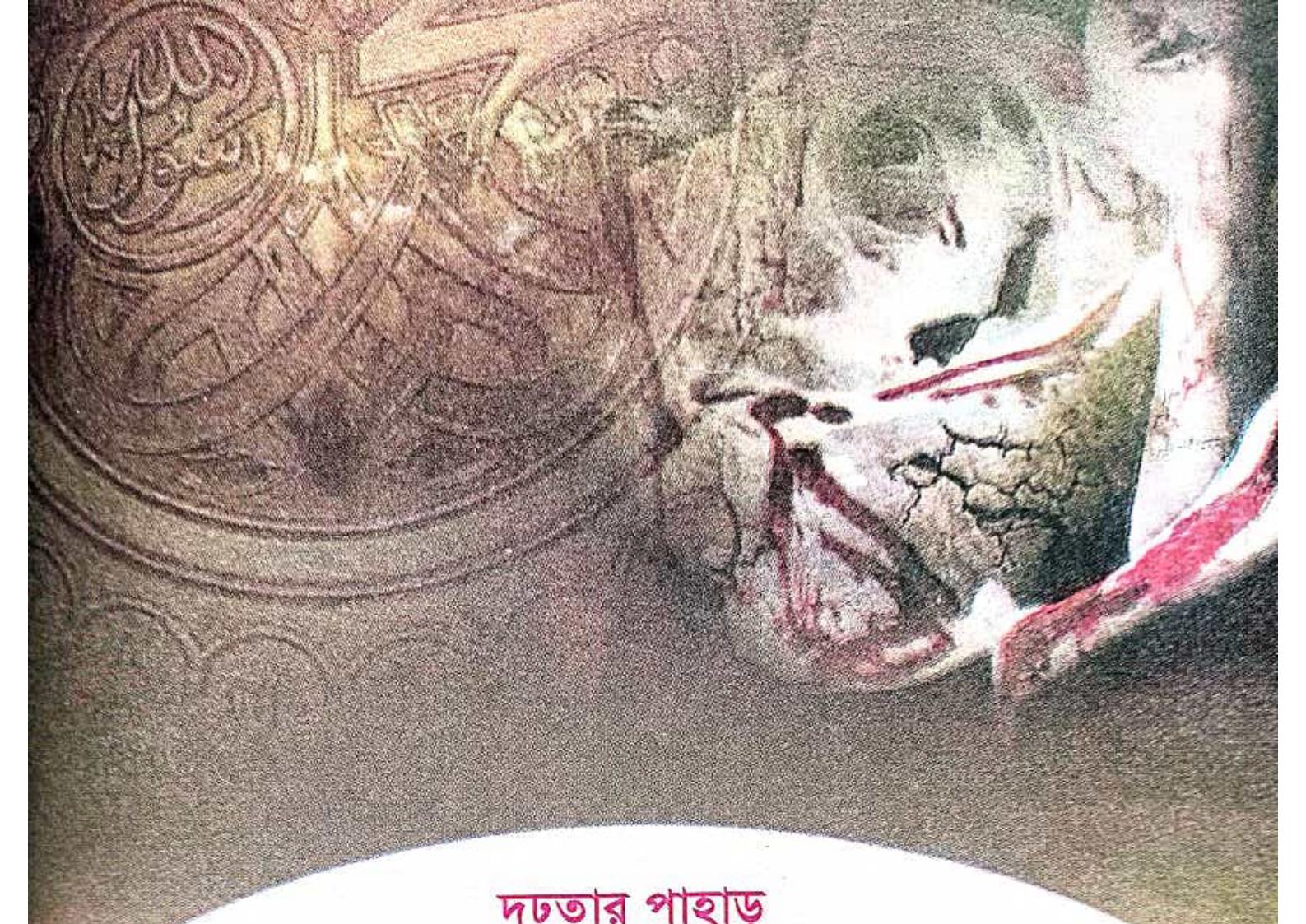
দৃঢ়তার পাহাড়

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মপ্রকাশের সূচনাতে মক্কায় তিনি দাওয়াতের কাজ করতেন গোপনে। মুসলমানরা তাদের ধর্মের বিষয় প্রকাশ করতেন না। যখন মুসলমানদের সংখ্যা ৩৮ জন হয়ে গেল, তখন আবু বকর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পীড়াপীড়ি করলেন ইসলাম প্রকাশ করার জন্য। জনসম্মুখে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। নবীজী বললেন–

আবু বকর! আমরা তো সংখ্যায় কম।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে তিনি মসজিদে হারামের উদ্দেশে বের হলেন। মুসলমানরা তাঁর সঙ্গী হলেন।

মসজিদে হারামের বিভিন্ন কোণায় ভাগ হয়ে গেলেন তারা। লোকজনের সামনে বক্তৃতা করার জন্য দাঁড়ালেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু।

তিনি হলেন প্রথম খতীব, যিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। মুশরিকরা যখন দেখল, আবু বকর দেবদেবীর নিন্দা করছেন এবং তাদের ধর্মকে খাটো করছেন, তখন তারা মুসলমানদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। মসজিদের প্রত্যেক কোণায় তারা মুসলমানদেরকে বেদম মারধর করল।

আবু বকর তাঁর নতুন ধর্মের কথা প্রকাশ করছিলেন। একদল মুশরিক তাঁকে ঘিরে ফেলল। তারা তাঁকে খুব মারধর করল। মারের চোটে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। তখন তিনি প্রায় বুড়ো– বয়স পঞ্চাশের মত।

দুষ্ট উতবা ইবনে রবীআ এগিয়ে এল আবু বকরের কাছে। তাঁর পেটে ও বুকে পারাল কতক্ষণ। চামড়া জড়ানো জুতা দিয়ে তাঁকে প্রহার করতে থাকল। প্রহার করতে থাকল চেহারার উপর। আবু বকরের চেহারার মাংস থেতলে গেল। মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। এমন কি নাক মুখ ঠাওর করাও কঠিন হয়ে পড়ল এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন।

সাহায্য করার জন্য আবু বকরের কবিলা বনী তামীম এগিয়ে এল। মুশরিকদেরকে ঠেলে সরিয়ে দিল তারা। এরপর আবু বকরকে একটি কাপড়ের ভিতর তুলে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেল। তাদের কাছে মনে হল আবু বকর মারা গেছেন। বনী তামীমের লোকজন আবার ফিরে এল। মসজিদে প্রবেশ করল তারা। মুশরিকদেরকে লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে বলল, আবু বকর যদি মারা যান, তা হলে আল্লাহর কসম! আমরা উতবা ইবনে রবীআকে মেরে ফেলব।

আবু বকরের পাশে তাঁর পিতা আবু কোহাফা বসলেন। সবাই তার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করল; কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না।

দিনের শেষে আবু বকর চোখ মেললেন। প্রথম যে কথা তিনি বললেন, তা হল, 'রসুলুল্লাহ কেমন আছেন?'

একথা শুনে তাঁর পিতা রাগান্বিত হয়ে তাকে গালি দিলেন। এরপর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তখন তাঁর মা এসে মাথার কাছে বসলেন। তাঁকে কিছু খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা করলেন। পীড়াপীড়ি করলেন।

কিন্তু আবু বকর একই প্রশ্ন বার বার করছিলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন?
মা বললেন, আমি তোমার বন্ধুর কথা কিছুই বলতে পারব না।

আবু বকর বললেন, তুমি খাত্তাবের মেয়ে উম্মে জামীলের কাছে যাও। তাকে জিজ্ঞেস করো।

উম্মে জামীল আগেই মুসলমান হয়েছিলেন; কিন্তু বিষয়টি গোপন ছিল। উম্মে জামীলের কাছে গিয়ে হাজির হলেন আবু বকরের মা। বললেন, আবু বকর তোমার কাছে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন।

মুশরিকরা তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি জেনে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করলেন উম্মে জামীল। এজন্য তিনি বললেন, আমি আবু বকরকে চিনি না; চিনি না মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকেও। তবে আপনি কি চান যে, আমি আপনার সাথে আপনার ছেলের কাছে উপস্থিত হই? আবু বকরের মা বললেন, অবশ্যই।

উম্মে জামীল আবু বকরের মায়ের সাথে এসে আবু বকরের ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, আবু বকর গুরুতর অসুস্থ। বিছানায় পড়ে আছেন। তাঁর চেহারা থেতলানো। যখম থেকে রক্ত ঝরছে।

উম্মে জামীল আবু বকরকে দেখে কেঁদে ফেললেন। বললেন, যারা আপানার সাথে এমন আচরণ করেছে, তারা অবশ্যই পাপিষ্ঠ, কাফের। আমি অবশ্যই আশা করছি যে, আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে এই জুলুমের প্রতিশোধ নিবেন।

খুব কষ্টে উম্মে জামীলের দিকে তাকালেন আবু বকর। বললেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন?

উম্মে জামীল আবু বকরের মায়ের দিকে তাকালেন। তিনি তখনও ইসলাম কবুল করেননি। তিনি হয়তো কাফেরদেরকে মুসলমানদের গোপন খবর জানিয়ে দিতে পারেন, এ আশঙ্কাবোধ করলেন উম্মে জামীল। তিনি বললেন, আবু বকর! ইনি আপনার মা; ইনি তো শুনতে পাচ্ছেন।

আবু বকর বললেন, এঁকে নিয়ে তোমার কোন ভয় নেই।
উম্মে জামীল বললেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।

আবু বকর বললেন, এখন কোথায় আছেন তিনি?

উম্মে জামীল বললেন, আবুল আরকামের বাড়িতে।

আবু বকরের মা বললেন, তোমার বন্ধুর খবর জেনে ফেলেছ। এবার ওঠো; কিছু খাও, পান করো।
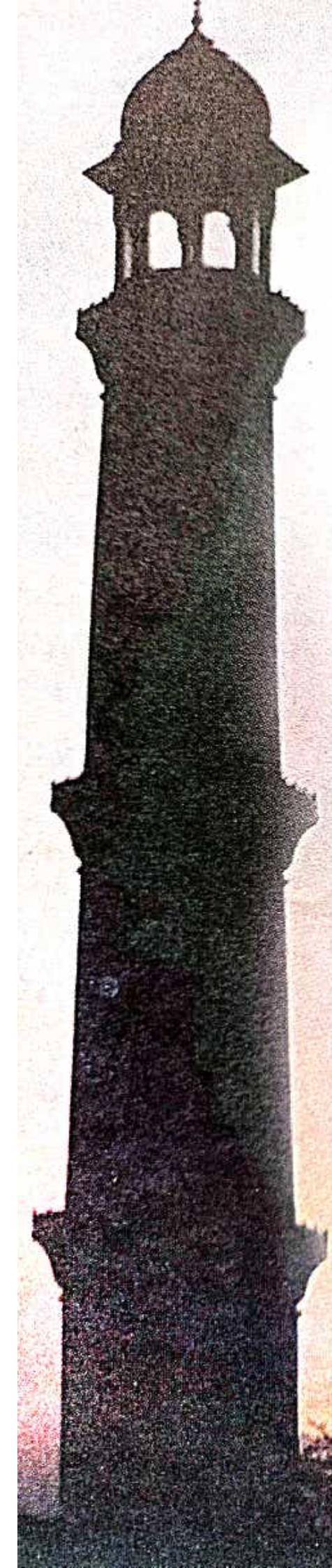
আবু বকর বললেন, আল্লাহর কসম! রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁকে নিজ চোখে না দেখা পর্যন্ত কোন খাবার বা পানীয় স্পর্শ করব না।

আবু বকরের মা ও উম্মে জামীল অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক সময় রাত নেমে এল। বন্ধ হয়ে গেল লোকজনের চলাচল। আবু বকর দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। তখন আবু বকরের মা ও উম্মে জামীল দু'জন তাঁকে নিয়ে বের হলেন। দু'জনের কাঁধে ভর করে চলতে লাগলেন আবু বকর। উম্মে জামীল ও আবু বকরের মা তাকে সঙ্গে নিয়ে আবুল আরকামের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তাঁকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন তাঁরা।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন আবু বকরের চেহারা থেতলানো। তাঁর কাপড়চোপড় ছেঁড়া এবং শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। ঝুঁকে গিয়ে তাঁকে চুম্বন করলেন নবীজী। উপস্থিত মুসলমানরাও চুম্বন করলেন তাঁকে। আবু বকরের অবস্থা দেখে নবীজী অত্যন্ত ব্যথিত হলেন।

আবু বকর নবীজীকে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার উপর আমার মা-বাবা কুরবান হোন। কোন অসুবিধা নেই। ওই দুষ্ট আমার চেহারায় আঘাত করেছে বলে একটু সমস্যা হয়েছে।

আবু বকর বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ইনি আমার মা।

ইনি তাঁর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করে থাকেন। আপনি একজন বরকতময় সত্তা। আপনি এঁকে আল্লাহর পথে আসার জন্য দাওয়াত দিন এবং এঁর জন্য দোআ করুন। তা হলে হয়তো আল্লাহ এঁকে জাহান্নামের আযাব থেকে রেহাই দিবেন।

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের মায়ের জন্য দোআ করলেন। তারপর তিনি দাওয়াত দিলেন তাঁকে। কালক্ষেপণ না করে সেখানেই ইসলাম কবুল করলেন আবু বকরের মা।

প্রিয় পাঠক! ধৈর্য ও দৃঢ়তার এই পাহাড়ের দিকে লক্ষ করুন, যাকে আমরা আবু বকর বলে থাকি। আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ব্যাপারে তাঁর স্পৃহা নিয়ে চিন্তা করুন; দীনের উপর তাঁর দৃঢ় থাকার শক্তি প্রত্যক্ষ করুন।

একটু নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, ইসলামের জন্য আপনি কী করেছেন? আপনার হাতে কয়জন হেদায়েত পেয়েছে। আপনি আল্লাহর রাস্তায় মসিবত সহ্য করেছেন। আপনি কি সৎ কাজে আদেশ, আর অসৎ কাজ থেকে বারণ করেন? আবু বকরের মত সাহসী হোন; হোন পাহাড়ের মত দৃঢ়। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন; মদদ করবেন।

সুগন্ধময় যুবক

এক এলাকায় এক দরিদ্র যুবক বাস করতেন। দরিদ্র হলেও খুব পরহেযগার ছিলেন। তাঁর রগরেশায় আল্লাহর ভয় আঁটানো ছিল। আল্লাহর যিকিরে সবসময় তাঁর জিহ্বা তাজা থাকত। শয়তান তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। হালাল রিযিক উপার্জনে যুবক অলিগলি দিয়ে বিভিন্ন পণ্য ফেরি করে বেচতেন।

একবার তিনি এক মহিলার বাড়ির পাশ দিয়ে পণ্য নিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলেন। মহিলা ছিল বদকার। হালাল-হারামের পরোয়া ছিল না। যেকোন হারাম কাজে লিপ্ত হতে এতটুকুও বিচলিত হত না সে।

মহিলা দরজার আড়াল থেকে যুবককে দেখে ডাক দিল। বলল, তোমার পণ্য নিয়ে ভিতরে আসো। আমি একটু দেখতে চাই।

যুবক ভিতরে আসার সাথে সাথে মহিলা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। এরপর হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য আহ্বান করল। যুবক চেঁচিয়ে উঠে বলল, নাউযু বিল্লাহ! এমন ঘৃণ্য কাজে তো আমি কখনও লিপ্ত হইনি।

যুবক কিয়ামতের দিনের প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, দুনিয়ার সমস্ত হারাম মজা খতম হয়ে যাবে; শুধু দুঃখ আর বেদনা বাকি থাকবে। দুনিয়াতে যেসব অঙ্গ ব্যবহার করে হারাম কাজ করা হয়, আল্লাহর না-ফরমানী করা হয়, সেগুলো হাশরের ময়দানে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। কান সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, আমাকে ব্যবহার করে তোমার বান্দা অমুক না-ফরমানী করেছে। হাত বলবে, আমার সাহায্যে সে হারাম জিনিস ধারণ করেছে। এভাবে যবানও সাক্ষ্য দিবে। প্রতিটি লোম মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

এরপর যুবক জাহান্নামের আগুন ও আল্লাহর আযাবের কথা উল্লেখ করে মহিলাকে বলল, কিয়ামতের দিন যেনাকারীদেরকে জাহান্নামের ভিতরে উল্টো করে ঝোলানো হবে। লোহার চাবুক দিয়ে পেটানো হবে তাদেরকে। যখন মারের চোটে যেনাকারীরা চেঁচিয়ে ফরিয়াদ করবে, তখন ফেরেশতারা বলবেন, এভাবে চিৎকার করছ কেন?

তোমরা তো (যেনার সময়) খিলখিয়ে হাসতে;

কত আনন্দ করতে; দম্ভ নিয়ে চলাচল করতে। আল্লাহর আযাবের কোন ভয় তো তোমাদের ছিল না। একটু লজ্জা হত না তোমাদের।

যুবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস স্মরণ করিয়ে দিলেন–

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

হে উম্মতে মুহাম্মাদ! আল্লাহ সবচেয়ে বেশি রাগান্বিত হন বান্দাবান্দীকে যেনায় লিপ্ত দেখলে। হে উম্মতে মুহাম্মাদ! আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তা হলে তোমরা খুব কম হাসতে এবং খুব বেশি কাঁদতে।

যুবক সেই দিনের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন, যেদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে অনেক নারীপুরুষকে দেখতে পান। যারা একটি তন্দুরের মত ছোট গর্তের মধ্যে একেবারে উলঙ্গ ছিল।

তন্দুরের উপরের অংশ ছিল সঙ্কীর্ণ, নীচের অংশ ছিল প্রশস্ত। তারা খুব কান্নাকাটি করে ফরিয়াদ করছিল। যখন নীচ থেকে আগুনের শিখা ধেয়ে উঠত, তখন সীমাহীন কষ্টের কারণে চেঁচিয়ে উঠছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিব্‌রাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেন, এরা কারা? জিব্‌রাঈল জওয়াব দেন, এরা যেনাকার নারী-পুরুষ। কিয়ামতের দিন এভাবেই তাদের আযাব হতে থাকবে। আখেরাতের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা আল্লাহ তাআলার মাফ ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

শয়তান মহিলার উপর আবারও হামলা করল। সে বলল, নাও; কিছুই হবে না। যেনা করে তওবা করে নিয়ো।

যুবক বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। যে নারী আমার জন্য হালাল নয়, তার দিকে আমি কীভাবে দৃষ্টিপাত করব? আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় কীভাবে পয়মাল করব। কক্ষণও হতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে দেখছেন। আমরা মাখলুক থেকে আড়ালে থাকি; কিন্তু খালেকের সামনে একের পর এক গুনাহ করতে থাকি।

যুবক কিছুক্ষণ ভাবলেন এবং মহিলার বেষ্টনি থেকে বের হতে চেষ্টা করলেন। দরজায় নজর বুলালেন তিনি। তখন মহিলা চেঁচিয়ে উঠল, আল্লাহর কসম! তুমি যদি আমার ইচ্ছা পূরণ না কর, তা হলে আমি শোরগোল করব। লোকজন একত্র হবে। তখন আমি বলব, এই লোক আমার ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। তারপর তোমাকে মৃত্যুর মুখে নিক্ষেপ করা হবে; অথবা পুরে দেওয়া হবে জেলখানায়।

একথা শুনে যুবক কেঁপে উঠলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এই মহিলা তার ঘৃণ্য মতলব থেকে ফিরবে না। তিনি মনে মনে আরেকটি কৌশল ঠিক করলেন। মহিলাকে তিনি বললেন, আমার তো একটু পায়খানায় যেতে হবে।

মহিলা তাকে পায়খানা দেখিয়ে দিল। যুবক পায়খানায় ঢুকে জানালা দিয়ে বের হওয়ার কথা চিন্তা করলেন; কিন্তু জানালা ছিল খুব সঙ্কীর্ণ।

তখন বাধ্য হয়ে অন্য কৌশলের কথা ভাবলেন তিনি। ভাবনা অনুযায়ী পায়খানা থেকে কিছু মলমূত্র তুললেন এবং তা গায়ে, কাপড়ে ও হাতে মাখলেন। এরপর উপস্থিত হলেন মহিলার সামনে। মহিলা তাঁকে দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। সামনে রাখা পণ্যগুলো উঠিয়ে যুবকের মুখে নিক্ষেপ করল। তারপর তাঁকে ঘর থেকে বের করে দিল। যুবক পরিত্রাণ পেয়ে রাস্তা দিয়ে চলে যেতে লাগলেন। শিশুরা তাঁকে দেখে পাগল পাগল বলে শোরগোল করতে থাকল।

বাসায় ফিরে যুবক গোসল করলেন। এমন আজব কৌশলে নিজেকে পাপ কাজ থেকে হেফাজত করার কারণে আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেই পুরস্কৃত করলেন। যুবকের দেহ সুগন্ধময় করে দিলেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর দেহ থেকে খোশ্‌বু পাওয়া যেত।

তিনি এখন জান্নাতের নহরে

মায়েয আসলামী রাযিয়াল্লাহু আনহু নামে একজন জোয়ান সাহাবী ছিলেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন মদীনায়। একদিন শয়তান তাঁকে ওয়াসওয়াসা দিল। এক আনসারী ব্যক্তির দাসীর ব্যাপারে প্ররোচনা দিল তাকে। মায়েয দাসীকে নিয়ে নির্জনে গেলেন। তখন তাদের তৃতীয় জন হয়ে গেল শয়তান। শয়তান দুজনের প্রত্যেককে অপরের কাছে মোহনীয় করে তুলল। এক পর্যায়ে তাঁরা হারামে লিপ্ত হয়ে গেলেন।

অপরাধ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর মায়েযের কাছ থেকে শয়তান কেটে পড়ল। মায়েয ভাবনায় পড়ে গেলেন। ভেঙে পড়লেন কান্নায়। নিজেকে খুব ভর্ৎসনা দিলেন। সঙ্কটময় হয়ে উঠল তাঁর জীবন। গুনাহের উপলব্ধি তাঁকে ঘিরে ধরে কলজে জ্বালিয়ে ফেলল।

তখন তিনি রূহের চিকিৎসক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরের কথা প্রকাশ করে দিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি যেনা করেছি; আমাকে পবিত্র করুন।

নবীজী তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মায়েয অপর দিক থেকে তাঁর সামনে এলেন। বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি যেনা করেছি; আমাকে পবিত্র করুন।

নবীজী বললেন, ধ্যাৎ! যাও। আল্লাহর কাছে মাফ চাও; তওবা করো।
মায়েয চলে গেলেন; কিন্তু কিছু দূর গিয়েই অধৈর্য হয়ে গেলেন। আবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে এলেন তিনি। বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! পবিত্র করুন।

রসুলুল্লাহ বললেন, আহ! তুমি যাও। আল্লাহর কাছে মাফ চাও; তওবা করো।
মায়েয চলে গেলেন। কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এলেন। বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে পবিত্র করুন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আহ্হা! তুমি কি জান, যেনা কী জিনিস?

এরপর হুকুম দিয়ে নবীজী তাঁকে তাড়িয়ে দেন। মসজিদ থেকে তাঁকে বের করে দেওয়া হয়।

তিনি তৃতীয় বার, চতুর্থ বার আবার উপস্থিত হন। যখন তিনি বেশি পীড়াপীড়ি করেন, তখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়েযের সম্প্রদায়ের লোকজনকে জিজ্ঞেস করেন, এর কি ভারসাম্য ঠিক আছে?

কওমের লোকজন বললেন, আমাদের জানামতে তাঁর কোন সমস্যা নেই।

নবীজী বললেন, তা হলে হয়তো সে মদ পান করেছে।

একথা শুনে এক লোক উঠল। তাকে পরখ করল। তাঁর মুখ শুঁকে মদের গন্ধ পেল না। তখন নবীজী তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জান যেনা কী জিনিস?

মায়েয বললেন, হাঁ; আমি এক নারীর সাথে হারামভাবে এমন কাজ করেছি, মানুষ স্ত্রীর সাথে হালালভাবে যা করে।

রসুলুল্লাহ বললেন, তোমার একথার উদ্দেশ্য কী?

মায়েয বললেন, আমাকে পবিত্র করুন।

নবীজী বললেন, আচ্ছা; ঠিক আছে।

এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন। মায়েযকে পাথর নিক্ষেপ করা হল। একসময় তিনি মারা গেলেন।

মায়েযের জানাযা পড়া হল। দাফন করা হল তাঁকে। তারপর নবীজী তাঁর কবরের পাশ দিয়ে কিছু সাহাবী সঙ্গে নিয়ে অতিবাহিত হলেন। তিনি শুনতে পেলেন তাঁর সঙ্গীদের মধ্য থেকে দু'জন একে অপরকে বলছে, এই লোকটির দিকে দেখো, আল্লাহ যার দোষ লুকিয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু তার নফস মানল না। ফলে তাকে কুকুরের মত পাথর নিক্ষেপ করে মারা হল।

তাদের কথা শুনেও নবী চুপ থাকলেন। চললেন আরও কিছুক্ষণ। এক পর্যায়ে রাস্তার পাশে একটি মরা গাধা দেখতে পেলেন। সূর্যের তাপে ঝলসে গেছে। ফুলে পা উপরের দিকে উঠে গেছে। নবীজী গাধাটি দেখে বললেন, অমুক আর অমুক কোথায়?

তারা দু'জন বলল, এই তো আমরা ইয়া রসুলাল্লাহ!

নবীজী বললেন, নামো; এই (মরা) নাপাক গাধার গোশ্‌ত খাও।
তারা দু'জন বলল, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ মাফ করুন। এই গোশ্‌ত কেউ খাবে?

রসুলুল্লাহ বললেন, তোমরা যে তোমাদের ভাইয়ের সম্মান খেয়েছ, তা মরা খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক। নিশ্চয় মায়েয এমন তওবা করেছে যে, তার তওবা একজাতির মধ্যে বণ্টন করে দিলে (সবার নাজাতের জন্য) যথেষ্ট হবে। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! নিশ্চয় এখন সে জান্নাতের নদনদীতে গোসল করছে।

সুসংবাদ মায়েয ইবনে মালেকের জন্য! হাঁ, তিনি যেনায় লিপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর ও আল্লাহর মাঝে যে পর্দা আছে, তা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু এমন তওবা করেছেন যে, সেই তওবা এক উম্মতের মধ্যে বণ্টন করে দিলে, তাদের নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে।

মা চলে গেলেন

অঝোর ধারায় চোখের পানি ছেড়ে তিনি তার বৃত্তান্ত পেশ করছিলেন। তাঁর বুড়ো মা তাকে অনেক ভালোবাসতেন; কিন্তু তার আচরণ ছিল বিপরীতমুখী। মা অনেক করে বুঝিয়েছেন, বাবা! এখানে থেকেই পড়াশোনা করো। এখানেই সবধরণের সুবিধা রয়েছে। আমার দৃষ্টির আড়ালে যেয়ো না। অশ্রুভরা চোখে তিনি আমার দিকে দেখছিলেন; আর কম্পমান দুর্বল হাত নাড়ছিলেন।

আমি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে দেখতে থাকি; শুনতে থাকি তাঁর কান্নার আওয়াজ। গুনাহ আমার অন্তর এতটাই শক্ত করে দিয়েছিল যে, মায়ের কান্না ও আহাজারিতেও আমার অন্তরে কোন আসর পড়ল না।

আমি তার সমস্ত স্নেহ-ভালোবাসা পিছনে ফেলে দিই। তাঁর শত অনুরোধ সত্ত্বেও আমাদের শহরে লেখাপড়া করার কথা অস্বীকার করি। দুনিয়ার রং আমার দিলদেমাগ পুরোপুরি আচ্ছন্ন করেছিল। স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতার জালে কঠিনভাবে আটকে গিয়েছিলাম। খাহেশাত ও লজ্জতের আঁচলে আমি পুরো ফেঁসে গিয়েছিলাম। জিন ও ইনসানের সমাজে বিদ্যমান শয়তান একজন আরেক জনকে সাহায্য করছিল এবং আমাকে ভুল সিদ্ধান্তে অটল থাকতে প্রেরণা যোগাচ্ছিল। আমি মায়ের শত উপদেশ, আদর, স্নেহ, ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পদদলিত করছিলাম। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে বিদায় জানাচ্ছিলেন। আমি তাঁর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেও তিনি আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি চলে যাওয়ার পর আমার পদচিহ্ন দেখে চোখের পানি ফেলছিলেন।

কিছু দিন অতিবাহিত হল; কিন্তু আমি ফিরলাম না। আমার কানে মায়ের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হত, বাবা! আমি তোমাকে আল্লাহর হেফাজতে সোপর্দ করছি। তোমার দিকে কেউ যেন বাঁকা দৃষ্টিতে না তাকায়। বাবা! তুমি কোথায় যাবে? মাঝে মাঝে কানে বাজত, বাবা! তুমি ফিরতে এত দেরি করলে কেন?

আমি আনন্দ-ফূর্তিতে মত্ত হয়ে গেলাম। স্বেচ্ছাচারিতা আমাকে গাফলতে ফেলে দিল। গুনাহের পর গুনাহ করতে লাগলাম। আমার কণ্ঠ ছিল সুন্দর। সেই সুন্দর কণ্ঠ আমাকে ধোঁকায় ফেলে দিল। খারাপ বন্ধু-বান্ধব আমাকে গান গাইতে উস্কানি দিল।

আমি গান গাওয়া শুরু করে দিলাম। শয়তান আমাকে এই শাস্ত্রে অনেক সহায়তা করল। একসময় আমার দিন বদলে গেল। থিয়েটার হলে গান গাওয়ার নিমন্ত্রণ পেলাম। প্রথম দিকে খুব ভয় হল। আমার ভিতরে প্রকৃতগত যে লজ্জাবোধ ছিল, তা আমাকে শাসাল। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করব কি না, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলাম। আমার দিল বলল, তুমি এ জগতের লোক নও। তুমি শরীফ খান্দানের ছেলে। আর গান গাওয়ার কাজ হল ইতরশ্রেণির। এভাবে দিল আমাকে ভর্ৎসনা দিতে থাকল। কিন্তু শয়তান আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলল, এটা তোমার জীবনে সুবর্ণ সুযোগ। হাতছাড়া কোরো না। রাতারাতি তোমার পরিচিতি সৃষ্টি হবে। অনেক ভাবা-চিন্তার পর শয়তানের পরামর্শ বিজয়ী হল। আমি প্রস্তাব কবুল করলাম।

মঞ্চে উঠে গানের প্রথম কলি বলতে বলতেই ভিতরের হায়ালজ্জার নিভু নিভু প্রদীপ একেবারে নিভে গেল। আমার জাদুমাখা কণ্ঠ শুনে পুরো থিয়েটার মাতাল হয়ে গেল। চারদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল তারীফ-প্রশংসার শ্লোগান।

আমার ভক্তদের পরিধি বাড়তে লাগল। আসতে লাগল নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণ। এখন আমি একেক রাত একেক জায়গা অতিবাহিত করি।

এমন কোন গুনাহ নেই, যাতে আমি লিপ্ত হই না। একদিন অনেক বড় এক কোম্পানী থেকে গান শোনার ওয়াফার এল। খুব আনন্দের সাথে সেই অফার আমি গ্রহণ করলাম এবং আগা-গোড়া সেই প্রোগ্রামে অংশ-গ্রহণ করলাম। অনুষ্ঠানের পর এক দক্ষ শিল্পী আমার সাথে দেখা করলেন। তিনি আমাকে আরও ভালো করা এবং আরও উন্নতি করার জন্য উৎসাহ দিলেন। তিনি আমাকে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দিলেন। এই শিল্পে আরও দক্ষতা অর্জন করার ব্যাপারে আমি তাঁর কাছে ওয়াদা করলাম। তার সাথে দেখা করার দিন ধার্য হল বুধবার। সময় খুব দ্রুত গড়িয়ে যেতে লাগল।

নির্দিষ্ট সময়ের দুই দিন আগেই আমি পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে এলাম। বাড়িতে কয়েকটি অনুষ্ঠান ছিল। বুধবারে ছিল দুই বোনের বিয়ে। বৃহস্পতিবারে ছিল ভাইয়ের অলীমা। আমার মায়ের আনন্দের কোন সীমা ছিল না। কখনও তিনি এদিকে আসছিলেন; কখনও ওদিকে যাচ্ছিলেন। আজব ধরণের মুচকি হাসি লেগেছিল তাঁর ঠোঁটে। সেই মুচকি হাসি যদি পুরো দুনিয়ায় ছিটিয়ে দেওয়া হত, তা হলে দুনিয়ার সবকিছু ঝলমলিয়ে উঠত। তারপর দিন ঢলে গেল। নেমে এল রাতের অন্ধকার। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। ছোটবড় সবাই মুবারকবাদ দিল মাকে।

পরের দিন বুধবার। আমার দুই বোনের হাত মেহেদীর রঙে লাল হয়ে উঠছিল। কিন্তু আচানক এক বিপদ আমাদের উপর নেমে এল। সেই বিপদ আমাদের জীবনের সবকিছু এলমেল করে দিল। সেই আচমকা বিপদ আমাকে গাফলতের ঘুম থেকে জাগ্রত করল। আমার মৃত দিল জীবন লাভ করল। হয়তো বা আমাকে পাপের অন্ধকার রাজ্য থেকে বের করা এবং গান গাওয়ার লজ্জা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই সেই মহাবিপদ নেমে এসেছিল।

আমার মা আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। এভাবে মা আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন, তা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। একটু আগে যিনি অমাদের সাথে আনন্দে শরীক হচ্ছিলেন, তিনি এখন চির নিদ্রায় শুয়ে পড়েছেন। তাঁর প্রাণহীন দেহ খাটিয়ার উপর পড়ে ছিল। তিনি তখন নীরব ভাষায় বলছিলেন, হে আমার সন্তানেরা! বিদায়। এখন তোমরা বড় হয়েছ। এখন তোমাদের সহায়তার প্রয়োজন নেই।

ঘরে ক্রন্দনরোল পড়ে গেল। সবার চেহারা বিষণ্ন। সানাইয়ের আওয়াজ কান্নার মধ্যে ডুবে গেল। সবার চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত। দিল নিয়ন্ত্রণ মানছিল না। চতুর্দিক থেকে শোনা যাচ্ছিল ফোঁপানোর আওয়াজ। সবাই কাঁদছিল; শুধু আমার মা সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে নীরব ছিলেন। তিনি কি জানছিলেন, তাঁর চারপাশে কী হচ্ছিল?

জানাযার প্রস্তুতি শুরু হল। মহিলারা তাকে গোসল দিলেন। গোসল সম্পন্ন হলে আমি তাঁর চেহারার দিকে দেখলাম। কী শান্ত সুস্থ চেহারা। তাঁর চোখ-মুখ ভালো করে দেখলাম। তাঁর কপালে চুমু দিলাম। আমার চোখ অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হচ্ছিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম।

কান্নায় ভেঙে পড়ছিল আমার বোনেরা। সময় খুব দ্রুত গড়িয়ে গেল। মায়ের দেহ জানাযার ময়দানে নিয়ে যাওয়া হল। জানাযার নামায পড়লাম। আমার দেহের প্রতিটি লোম দোআ করতে লাগল। আমি আল্লাহকে ডাক দিয়ে বললাম, আমি সবসময় মায়ের না-ফরমানী করেছি। কখনও তাঁর কথা শুনিনি। তাঁর হক আদায় করিনি। আল্লাহ! তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

মায়ের দেহ কবরস্তানে নিয়ে যাওয়া হল। আমরা তাঁর কবরে মাটি ঢালতে ঢালতে দোআ করলাম, হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে কালেমায়ে হকের উপর অবিচল রাখো; হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে কালেমায়ে হকের উপর অবিচল রাখো।

শোকার্তদের সাথে সারা দিন অতিবাহি হল। রাত নেমে আসার পর আমি তাড়াতারি কামরায় প্রবেশ করলাম। লাইট বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অতীতের স্মৃতি বিদ্যুতের কুমকুমের মত বহু দূর পর্যন্ত চমকে উঠল। এসব স্মৃতি আমাকে কষ্ট দিতে লাগল। অতীতের এক কোণে আমার মায়ের কণ্ঠ শোনা গেল। গুঞ্জরিত হয়ে উঠল পুরো কামরা–

বাবা! উঠো। নামাযে অলসতা কোরো না। ওঠো বাবা! তোমার সাথি তোমার জন্য মসজিদে অপেক্ষা করছে। বেটা আমার! আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। এখানে থেকেই লেখাপড়া করো।

আহ! আমি আমার মায়ের কোন কথাই শুনিনি। এখন আফসোস করে কী লাভ হবে, যখন পাখি খেত থেকে উড়ে গেছে। দুঃখবেদনা থেমে থেমে জাগরিত হচ্ছিল। আমার উপর ভেঙে পড়ছিল দুঃখ ও পেরেশানির পাহাড়। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

গত দিনগুলোতে মায়ের যে পরিমাণ না-ফরমানী করেছিলাম, ফিল্মের সুরতে সব আমার সামনে উপস্থিত হতে লাগল। তিনি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন; কিন্তু আমি তাঁর ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবে কিছুই দিতাম না।

তিনি আমাকে সন্তুষ্ট রাখতেন; আমি তাঁকে পেরেশানী ও দুঃচিন্তায় ফেলে দিতাম। তাঁর আদরস্নেহের কথা থেমে থেমে মনে পড়তে লাগল; কিন্তু এখন দুঃখ করা ছাড়া আমার কিছুই করার নেই।

আহ! মায়ের কত অবাধ্য ছিলাম আমি। আমার দিল আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, একটু চিন্তা করে দেখো তো, আখেরাতে তোমার সাথে কী আচরণ করা হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

মায়ের সম্পর্কের বড় হকদার আর কে আছে? আমার ভয় হল। মায়ের না-ফরমানী করেছি। এখন এই দুনিয়াতেই সাজা ভোগ করতে হবে। আমার ছেলেমেয়েও আমার সাথে একই আচরণ করবে।

আমি জোরে চিৎকার দিলাম; আল্লাহর কাছে দোআ করলাম, হে আল্লাহ! যদি আমার মা জীবিত হয়ে ফিরে আসতেন, তা হলে কপালে চুমু দিতাম। চোখের পানি দিয়ে তাঁর পা ধুয়ে দিতাম।

বার্ধক্য সত্ত্বেও তিনি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। আহ্! তিনি আমাকে পেটে ধারণ করেছিলেন; আমাকে দুধ পান করিয়েছিলেন। আমার জন্য রাতের পর রাত জাগ্রত থাকতেন। আহ্! আমার অন্তর কত পাষাণ ছিল।

পিতার সাথেও আমার আচরণ ভালো ছিল না। আমি কাঁদতে লাগলাম। সাথে সাথে নামায পড়লাম। কুরআন শরীফ পড়তে চেষ্টা করলাম; কিন্তু আমার যবান নির্বাক হয়ে গেল। দিলের গভীর থেকে কান্নাভরা দোআ বেরিয়ে এল। দেহের প্রতিটি লোম সেই দোআর উপর আমীন বলতে থাকল। আমি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম, মা যখন মরেই গেছেন, এখন আমি তাঁর কল্যাণে কাজ করব। তাঁর জন্য দোআ করব। তাঁর পক্ষ থেকে সদকা করব। আল্লাহর কাছে মাগফেরাতের দরখাস্ত করব। আমি আল্লাহকে বললাম, আমাকে এই প্রতিজ্ঞার উপর অবিচলতা দান করো। বার বার এই দোআটি পড়লাম–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

হে দিল পরিবর্তনকারী! আমার দিলকে তোমার দীনের উপর অটল রাখো।

আমি নামায শেষ করলাম। তারপর নিজের ভয়ানক অতীতের উপর নজর বুলালাম। রেকর্ড খুলে বসলাম। রেজিস্টার চেক করতে লাগলাম। একটি রেজিস্টার ছিল শুধু গান ইত্যাদির। কিছু চিঠিপত্র, ফটো, গানের কিছু ক্যাসেট এবং কিছু নোংরা ফিল্ম বের হল। এরপর আমি পকেটে হাত দিলাম। কয়েকটি চিরকুট পাওয়া গেল। একটি চিরকুটের মধ্যে বৃহস্পতিবারে উন্মাদনার মাহফিলে শরীক হওয়ার ওয়াদা ছিল। আমি সেটা সাথে সাথে ছিঁড়ে ফেললাম এবং নিজের কর্মকাণ্ড স্মরণ করে কাঁদতে লাগলাম। নিজের গুনাহসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকলাম। এ ছিল মা চলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দিন। আল্লাহ তাঁকে মাগফেরাত করুন। আমীন।

সত্যের অনুসন্ধানে

সালমান ফারেসী। একজন উঠতি যুবক। সম্মানের সাথে বড় হয়েছিলেন জমিদারের ঘরে। তিনি ছিলেন কওমের সম্মানের পাত্র। এলাকার ভিতরে প্রভাবশালী। অন্যদের চেয়ে এগিয়ে এবং অনন্য। সালমান ফারেসী ছিলেন মাজুসী। আগুন পূজা করতেন এবং তাঁর পিতা ছিলেন গ্রামের প্রধান। তাঁর পিতা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং বাড়িতে আগুনের কাছে বসিয়ে রাখতেন। দীর্ঘ কাল আগুনের পাশে থেকে তিনি মাজুসী ধর্মের পণ্ডিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং পদ লাভ করেছিলেন অগ্নিমণ্ডপের পরিচালকের।

তাঁর পিতার একটি বিশাল খামার ছিল। নিজেই সেটা দেখাশোনা করতেন। একদিন তিনি দালানের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি সালমানকে বললেন, খোকা! আমি আজ ব্যস্ত আছি; তুমি খামারে যাও। একটু দেখাশুনা করো।

সালমান খুব খুশি হলেন। বাড়ির প্রকোষ্ট থেকে বের হয়ে খামারের পথ ধরলেন। পথিমধ্যে খ্রিস্টানদের একটি গির্জার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হলেন। সেখান থেকে উপাসনার আওয়াজ শোনা গেল। তাদের কর্মকাণ্ড দেখার জন্য তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন। খ্রিস্টানদের উপাসনা তাঁর কাছে ভালো লাগল। আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন তাদের প্রতি। মনে মনে (মনে মনে) বললেন, নিশ্চয়ই এই ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম।

সালমান গির্জার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের এই ধর্মের মূল উৎস কোথায়?

তারা বললেন, শামে। বিশেষজ্ঞরা সেখানেই থাকেন।

সালমান সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের কাছে থাকলেন। পিতার কাছে ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। যখন তিনি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন তাঁর পিতা বললেন, খোকা! কোথায় ছিলে (সারা দিন)?

সালমান বললেন, বাবা! আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিলাম, যারা গির্জার মধ্যে উপাসনা করছিল। তাদের ধর্মকর্ম যা আমি প্রত্যক্ষ করলাম, তা খুব ভালো লাগল। দেখলাম, তাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম।
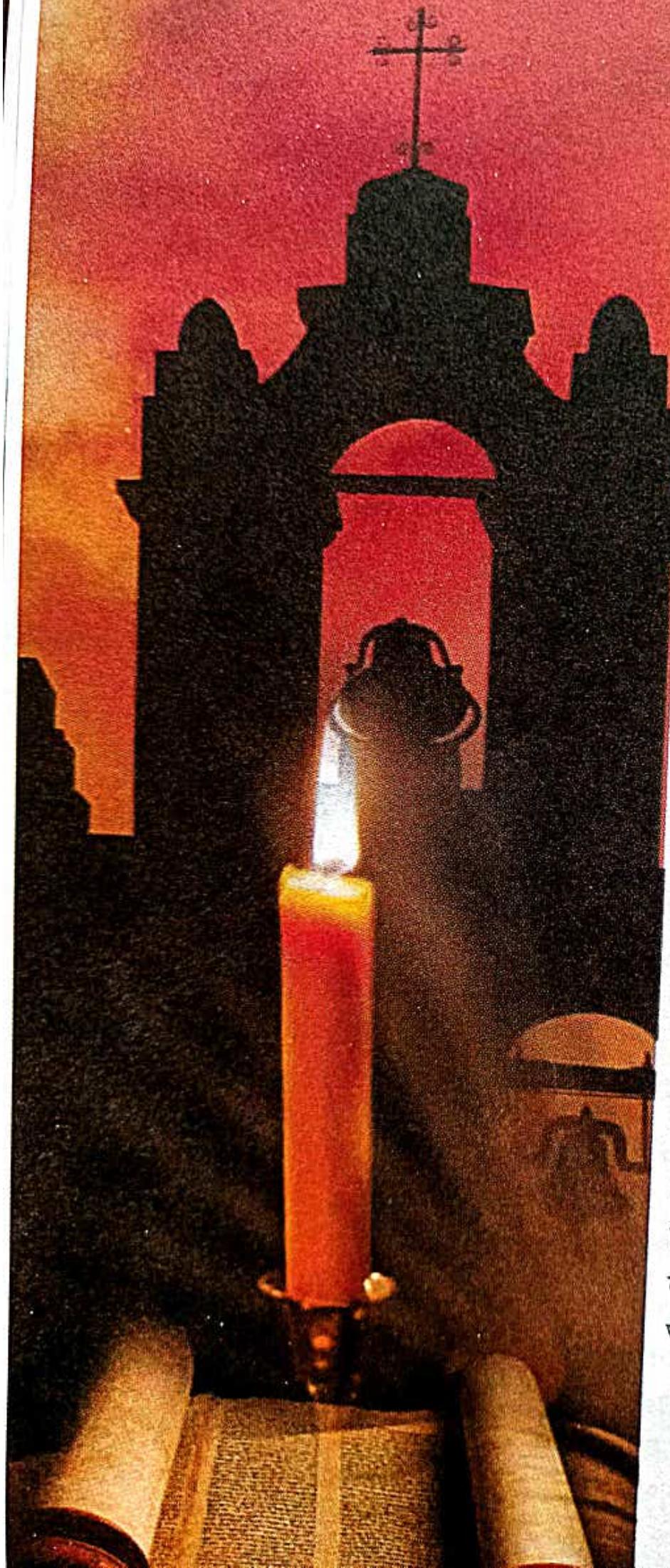
পিতা ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, তোমার ধর্ম, তোমার বাপদাদার ধর্ম ওই ধর্মের চেয়ে উত্তম।

সালমান বললেন, কক্ষনো নয়; তাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম।

একথা শুনে তাঁর পিতা আশঙ্কাবোধ করলেন যে, হয়তো সালমান মাজুসী ধর্ম ছেড়ে দিতে পারেন। এজন্য তিনি ছেলের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে ঘরের ভিতরে আটকে রাখলেন।

সালমান এ অবস্থা দেখে খ্রিস্টানদের কাছে একজন দূত পাঠালেন। বলে দিলেন, আমি আপনাদের ধর্মের উপর খুশি; যখন আপনাদের কাছে শাম থেকে খ্রিস্টান বণিক দল আসবে, তখন আমাকে খবর দিবেন।

এরপর কিছু দিনের মধ্যে শামের একটি খ্রিস্টান বণিক দল সালমানদের এলাকায় এল। গির্জার লোকজন সেই খবর সালমানকে অবহিত করল। সালমান বার্তাবাহককে বলে দিলেন, যখন তারা প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে দেশে ফেরার ইচ্ছা করবে, তখন আপনারা আমাকে আবার অবহিত করবেন।

একসময় বণিকদলের ফেরার সময় হল। সালমানের কাছে খবর পাঠাল তারা। সাক্ষাতের জন্য একটি স্থানের কথাও তারা বলে দিল। চেষ্টা করে পায়ের বেড়ি খুলে ফেললেন। তারপর বেরিয়ে পড়লেন এবং শাম অভিমুখে রওয়ানা হলেন।

শামে উপস্থিত হয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এই (খ্রিস্ট) ধর্মের সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?

লোকজন বলল, গির্জার বিশপ।

সালমান গীর্জায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। বিশপকে জানালেন নিজের পুরো বিবরণ। তিনি তাকে বললেন, আমি এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। আমি আপনার সাথে গির্জায় অবস্থান করে আপনার খেদমত করব; আপনার সাথে উপাসনা করব; আপনার কাছ থেকে ধর্ম শিখব।

বিশপ বললেন, তুমি থাকো আমার কাছে।

সালমান কিছুদিন তার সঙ্গে থাকলেন। সালমান চাইতেন নেককাজ করতে; এবাদত করতে এবং বেশি বেশি এবাদত করতে। কিন্তু এই বিশপ ছিলেন একজন ভণ্ড লোক। তিনি মানুষকে দান করতে আদেশ করতেন; উৎসাহ দিতেন। যখন লোকজন বিভিন্ন বস্তু নিয়ে আসত, তখন তিনি সেগুলো নিজের জন্য জমা করতেন;

গরীব-মিসকীনকে দিতেন না। এসব কর্মকাণ্ড দেখে তার প্রতি সালমান খুব ক্ষুব্ধ হলেন; কিন্তু বিষয়টি কাউকে জানাতে পারলেন না। তার কারণ, বিশপ তাদের দৃষ্টিতে মহামান্য। আর তিনি পরদেশী এবং নতুন খ্রিস্টান।

কিছু দিনের মধ্যে বিশপ মারা গেলেন। তখন তার কওমের লোকজন ব্যথিত হল তাকে দাফন করতে এল। সালমান তাদেরকে দুঃখিত হতে দেখে বললেন, নিশ্চয় এই লোকটা ছিলেন অসৎ। ইনি আপনাদেরকে দান-খয়রাত করতে আদেশ-উৎসাহ দিতেন। যখন আপনারা সেগুলো এর কাছে নিয়ে আসতেন, তখন ইনি সেগুলো নিজের জন্য সঞ্চয় করতেন; গরীবদেরকে কিছুই দিতেন না।

লোকজন বলল, একথার প্রমাণ কী?

সালমান বললেন, আমি আপনাদেরকে তার সঞ্চিত ভাণ্ডার দেখিয়ে দিচ্ছি।

এরপর তিনি তাদেরকে সেই জায়গা দেখিয়ে দিলেন। তারা মাটি খুড়ে সেখান থেকে সোনা-রূপা দিয়ে পূর্ণ সাতটি কলস বের করল। সেগুলো দেখার পর লোকজন বলল, আল্লাহর কসম! আমরা একে দাফন করব না।
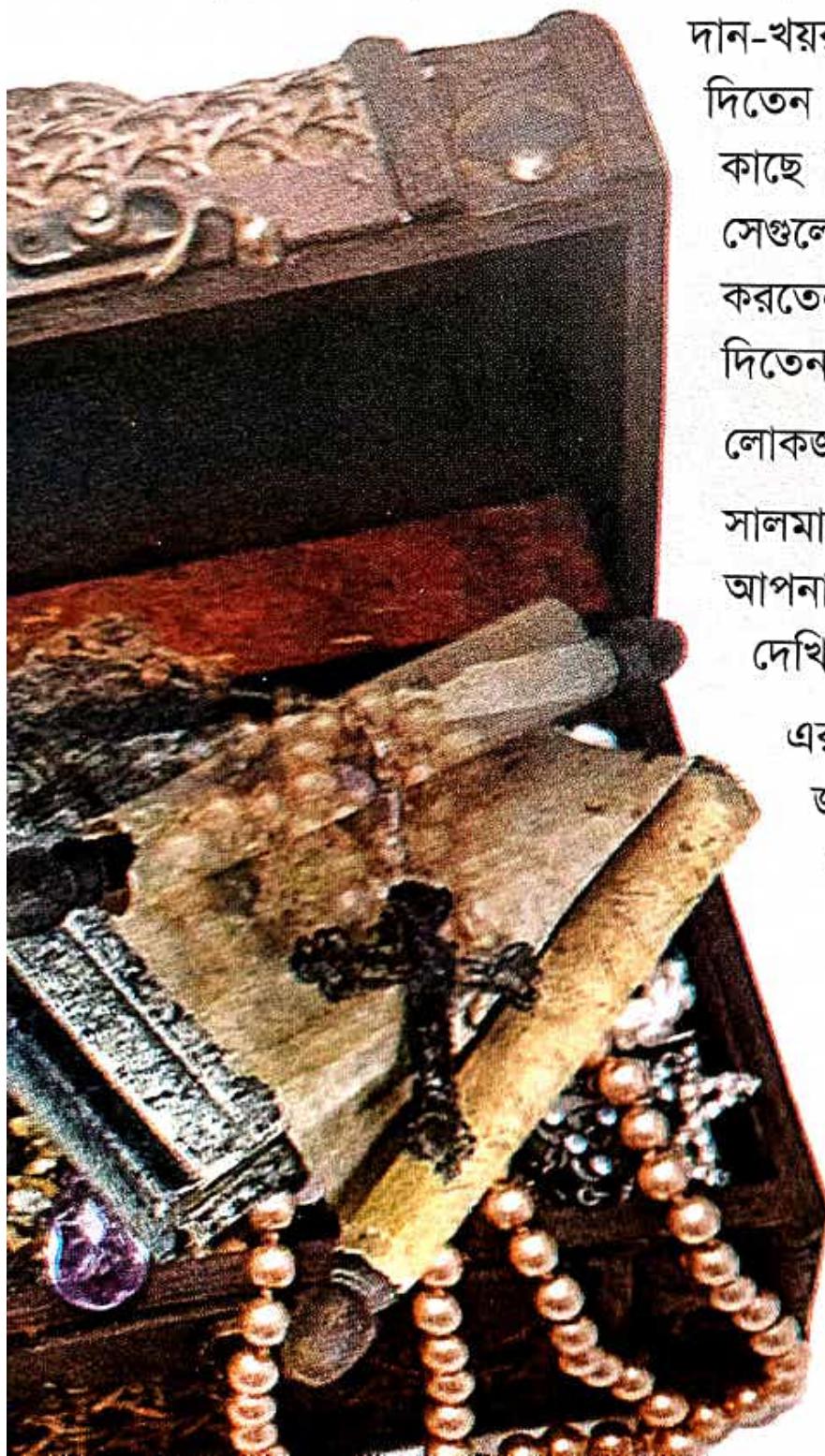
এরপর তারা বিশপের লাশটি শূলে চড়িয়ে পাথর নিক্ষেপ করল। তারপর আরেক ব্যক্তিকে এনে তার স্থলাভিষিক্ত করল তারা।

সালমান বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারীদের বাইরে আমি যত লোক দেখেছি, তাদের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে এর চেয়ে উত্তম, দুনিয়ার প্রতি উদাসীন, আখেরাত নিয়ে ব্যস্ত ও দিন-রাত এবাদতকারী আর কাউকে দেখিনি। আমি তাকে অনেক মহব্বত করে ফেললাম। আগে কাউকে এতটা মহব্বত করিনি।

সালমান তার কাছে অনেক দিন থাকলেন। একসময় লোকটি বুড়ো হয়ে গেলেন এবং তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। বিচ্ছেদের কথা ভেবে সালমান বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। বিশপের মৃত্যুর পর তিনি খ্রিস্টধর্মের উপর অবিচল থাকতে পারবেন না বলে তাঁর আশঙ্কা হল। বিশপকে লক্ষ করে তিনি বললেন, জনাব! আপনার প্রতি আল্লাহর যে নির্দেশ আসছে, তা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আপনি আমাকে কার কাছে যেতে উপদেশ দিবেন?

বিশপ বললেন, বৎস! এখন তো এমন কারও কথা জানি না, যিনি আমার মত সত্যের উপর অধিষ্ঠিত আছেন। মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা তাদের ধর্মের অনেক কিছু বিকৃত করেছে এবং বেশিরভাগ নির্দেশ বর্জন করেছে। তবে মাওসিলে একজন লোক আছেন। তিনি অমুক। আমি যে সত্যের উপর অধিষ্ঠিত ছিলাম, তিনি সেই সত্যের উপর অধিষ্ঠিত আছেন। তুমি তার সাথে গিয়ে মিলিত হও।

এরপর যখন এই আবেদ ব্যক্তির মৃত্যু হল, তখন সালমান শাম থেকে বের হয়ে ইরাকের দিকে রওয়ানা হলেন। উপস্থিত হলেন মাওসিলের বিশপের কাছে।

তার কাছে সালমান কিছু দিন থাকলেন। একসময় তার মৃত্যু ঘনিয়ে এল। তিনি তাকে নাসীবীনের এক ব্যক্তির কাছে যেতে উপদেশ করলেন। সালমান আবার ইরাক ছেড়ে শামের দিকে রওয়ানা হলেন। গিয়ে উপস্থিত হলেন নাসীবীনে।

সেখানকার বিশপের কাছে সালমান অনেক দিন থাকলেন। এক পর্যায়ে তাঁরও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল। তিনি তখন সালমানকে শামের আম্মুরিয়াতে অবস্থানকারী এক ব্যক্তির ব্যাপারে অসিয়ত করলেন। তিনি চলে গেলেন আম্মুরিয়াতে। সেখানকার বিশপের কাছে থাকতে লাগলেন। এখানে থাকতে গিয়ে সালমান কিছু আয়-উপার্জন করলেন। এতে তাঁর কাছে কিছু গরু-ছাগল জমা হল। ইতোমধ্যে বিশপ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এতে সালমান পেরেশান হয়ে গেলেন। বিশপের উদ্দেশে তিনি বললেন, জনাব! এখন আপনি আমাকে কোথায় যেতে বলবেন?

গীর্জার নেককার লোকটি বললেন, সালমান! আমরা যে সত্যের উপর ছিলাম, সেই সত্যের উপর কোন মানুষ অধিষ্ঠিত আছে বলে আমি জানি না যে, আমি তোমাকে তাঁর কাছে যেতে বলব। তবে তুমি এমন নবীর যামানার ছায়া পেয়ে গেছ, যিনি ইবরাহীমের ধর্ম নিয়ে আগমন করবেন।
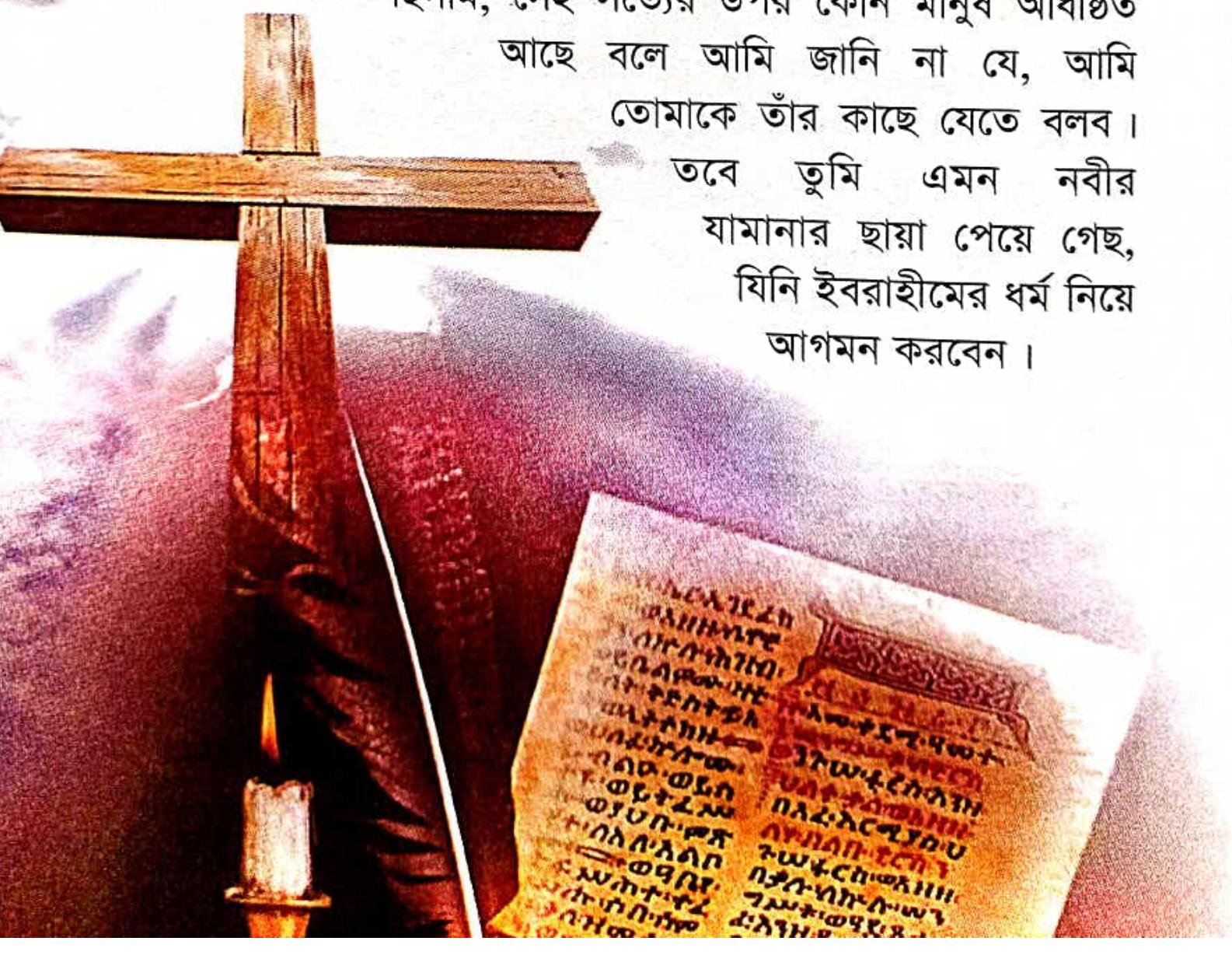
তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন আরবের একটি ভূখণ্ড থেকে; হিজরত করবেন দুটি প্রস্তরময় ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী এলাকায়, যেখানে খেজুরবাগান আছে। সেখানে আরও অনেক স্পষ্ট নির্দশন থাকবে। তিনি হাদিয়া খাবেন; সদকা খাবেন না। তাঁর দুই কাঁধের মাঝে থাকবে নবুয়তের মোহর। তুমি যদি সেই এলাকায় যেতে পার, তা হলে চলে যাও।

এরপর বিশপ মারা গেলেন, তাঁকে দাফন করা হল। আল্লাহর ইচ্ছায় সালমান আরও কিছুদিন আম্মুরিয়াতে থাকলেন। নবুয়তের ভূখণ্ডে কীভাবে পৌঁছনো যায়, তা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে বনী কালবের একদল বণিক ওখান দিয়ে অতিবাহিত হল। সালমান তাদেরকে তাদের এলাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা সালমানকে জানাল যে, তারা আরব অঞ্চলের অধিবাসী। তখন সালমান তাদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে আরবে নিয়ে গেলে আমার এই গরু-ছাগলগুলো তোমাদেরকে দিয়ে দিব।

তারা বলল, ঠিক আছে।

সালমান সেগুলো তাদেরকে দিয়ে দিলেন। তারা তাঁকে সঙ্গে নিল। কিন্তু যখন তারা ওয়াদীল কুরায় এল, তখন তারা লোভে পড়ে গেল। সালমানের প্রতি জুলুম করল তারা। সালমানকে তারা নিজেদের একজন ক্রীতদাস দাবি করে এক ইহুদী ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দিল। সালমান তাদের এই জুলুম রুখতে পারলেন না। সুতরাং সালমান গোলাম হিসেবে সেই ইহুদীর খেদমত করতে লাগলেন।

একদিন এই ইহুদী মনিবের চাচাত ভাই এল মদীনার ইহুদী সম্প্রদায় বনী কোরায়যা থেকে। সে সালমানকে কিনে মদীনায় নিয়ে গেল। তিনি যখন সেখানকার খেজুরবাগান ও পাথর দেখলেন, তখন বুঝে ফেললেন যে, এটাই নবুয়তের সেই ভূখণ্ড, যার বিবরণ তার কাছে শেষ বিশপ পেশ করেছিলেন।

যা হোক, সালমান এখানে থাকতে লাগলেন। অপেক্ষা করতে থাকলেন প্রেরিত পয়গাম্বরের জন্য। এর মধ্য দিয়ে কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। আল্লাহ তাঁর রসূলকে প্রেরণ করলেন। তিনি মক্কায় যত দিন থাকার থাকলেন। দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার কারণে সালমান তাঁর কোন তথ্য শুনতে পেতেন না।

একসময় পয়গাম্বর আলাইহিস সালাম মদীনায় হিজরত করে সেখানে বসতি স্থাপন করলেন। সে সম্পর্কেও সালমান কিছু জানতে পারলেন না।

একদিন তিনি মনিবের একটা খেজুর গাছের মাথায় চড়ে কাজ করছিলেন। ইহুদী মনিব বসে ছিল নীচে। এর মধ্যে তাঁর এক চাচাতো ভাই উপস্থিত হল। সে বলল, অমুক! (শুনেছ,) আল্লাহ বনী কায়লাকে ধ্বংস করুন। তারা কোবায় এক লোকের কাছে সমবেত হচ্ছে। লোকটি মক্কা থেকে এসেছেন এবং তার দাবি হচ্ছে তিনি একজন নবী। তার এই কথা যখন সালমানের কানে পড়ল, তখন তাঁর দেহ কেঁপে উঠল। তাঁর মন উড়ে গেল কোবায়। গাছের মাথায় চড়ে কাঁপতে লাগলেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা হল যে, তিনি মালিকের ঘাড়ের উপর পড়ে যাবেন। দ্রুত খেজুর গাছ থেকে নেমে এলেন সালমান। মনিবের চাচাতো ভাইকে লক্ষ করে বললেন, আপনি কী বললেন? কী বললেন আপনি? এই কৌতুহল দেখে সালমানের মনিব ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সে খুব জোরে একটি থাপ্পড় মারল সালমানকে। বলল, সে খবর শুনে তোমার কী লাভ? নিজের কাজে মনোযোগ দাও।

সালমান নীরব হয়ে গেলেন। গাছে চড়ে আবার কাজ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর অন্তর নবুয়তের খবর শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে গেল।

বিপশ বর্ণিত পয়গাম্বরের বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইলেন তিনি– তিনি হাদিয়া খাবেন; কিন্তু সদকা খাবেন না; তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নবুয়তের মোহর থাকবে।

দিন শেষ হয়ে রাত নেমে এল। নিজের কাছে খাবার-দাবার যা ছিল, তা একত্রে করে রসুলুল্লাহর উদ্দেশে তিনি বের হলেন।

নবীজী তখন কোবায় একদল সাহাবী নিয়ে বসে ছিলেন। সালমান বললেন, আমি খবর পেয়েছি আপনারা ভিনদেশী ও অভাবী। এই কয়েকটি জিনিস আমার কাছে ছিল, সদকার উদ্দেশ্যে রেখে দিয়েছিলাম। এগুলো আপনাদের জন্য এনেছি।

একথা বলে সালমান সেগুলো নবীজীর সামনে রাখলেন। এরপর একপাশে দাঁড়িয়ে রসুলুল্লাহ কী করেন, তা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের জিনিসগুলোর দিকে তাকালেন। তারপর সঙ্গীদেরকে বললেন, 'এগুলো তোমরা খাও।' নিজে সেগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন।

সালমান এই দৃশ্য দেখে মনে মনে বললেন, এ হল প্রথম (আলামত)– তিনি সদকা খাবেন না। আরও দুটি রয়ে গেল।

এরপর তিনি মনিবের কাছে চলে এলেন। কয়েক দিন পর আবার কিছু খাওয়ার জিনিস জমা করলেন। তারপর সেগুলো নিয়ে রসুলুল্লাহর কাছে উপস্থিত হলেন।

সালাম দিয়ে বললেন, আমি লক্ষ করেছি আপনি সদকা খান না; এগুলো হাদিয়া, সদকা নয়। আপনাকে প্রদান করলাম।

সালমান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রাখলেন সেগুলো। নবীজী সেগুলোর দিকে হাত প্রসারিত করলেন; নিজে খেলেন; সাথিদেরকে খাওয়ালেন।

সালমান মনে মনে বললেন, এ হল দ্বিতীয় (আলামত)। আরেকটি বিষয় বাকি থাকল– তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নবুয়তের মোহর আছে কি না। কিন্তু সেটা দেখার সুযোগ কোথায়। সালমান মনিবের খেদমতে ফিরে এলেন; কিন্তু তাঁর অন্তর নবীজীকে ঘিরে ব্যস্ত থাকল।

আরও কয়েক দিন অতিবাহিত হল। তারপর সালমান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোঁজে বের হলেন। তখন নবীজী বাকী' কবরস্তানে ছিলেন। তাঁর কোন সাহাবীর জানাযায় গিয়েছিলেন। সালমান তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরনে ছিল একজোড়া শামলা (চাদর)। সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বসে ছিলেন তিনি। একটি চাদর লুঙ্গির মত করে পরেছিলেন; আরেকটি গায়ে জড়িয়েছিলেন ইহরাম পরিধানকারীর মত। সালমান নবীজীকে সালাম দিলেন। এরপর তিনি বার বার তাঁর পিছনে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন, যাতে সেই মোহর দেখে নিতে পারেন, যার কথা বিশপ তাঁকে বলে দিয়েছিলেন। যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে তাঁকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে আগে বর্ণনা করা হয়েছে, এমন কোন বস্তু তিনি অনুসন্ধান করছেন। তিনি নিজের পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে ফেললেন। সালমান নবুয়তের মোহর দেখলেন। চিনতেও তাঁর ভুল হল না। ঝুঁকে পড়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে চুমো দিলেন সেটি।

তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন–

তুমি এদিকে ফেরো।

সালমান নবীজীর দিকে ফিরলেন। একেবারে মুখোমুখি হলেন তাঁর। নবীজী তাঁকে এ ব্যাপার জিজ্ঞেস করলেন। সালমান বর্ণনা করলেন তাঁর বিস্তারিত কাহিনী। তিনি নবীজীকে জানালেন, তিনি ছিলেন তরুণ যুবক। সম্মান ও রাজত্ব ছেড়েছেন হেদায়েত আর ঈমান পাওয়ার জন্য। বিশপদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন; তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। অবশেষে মদীনায় এসে ইহুদীর কাছে গোলাম হয়েছেন।
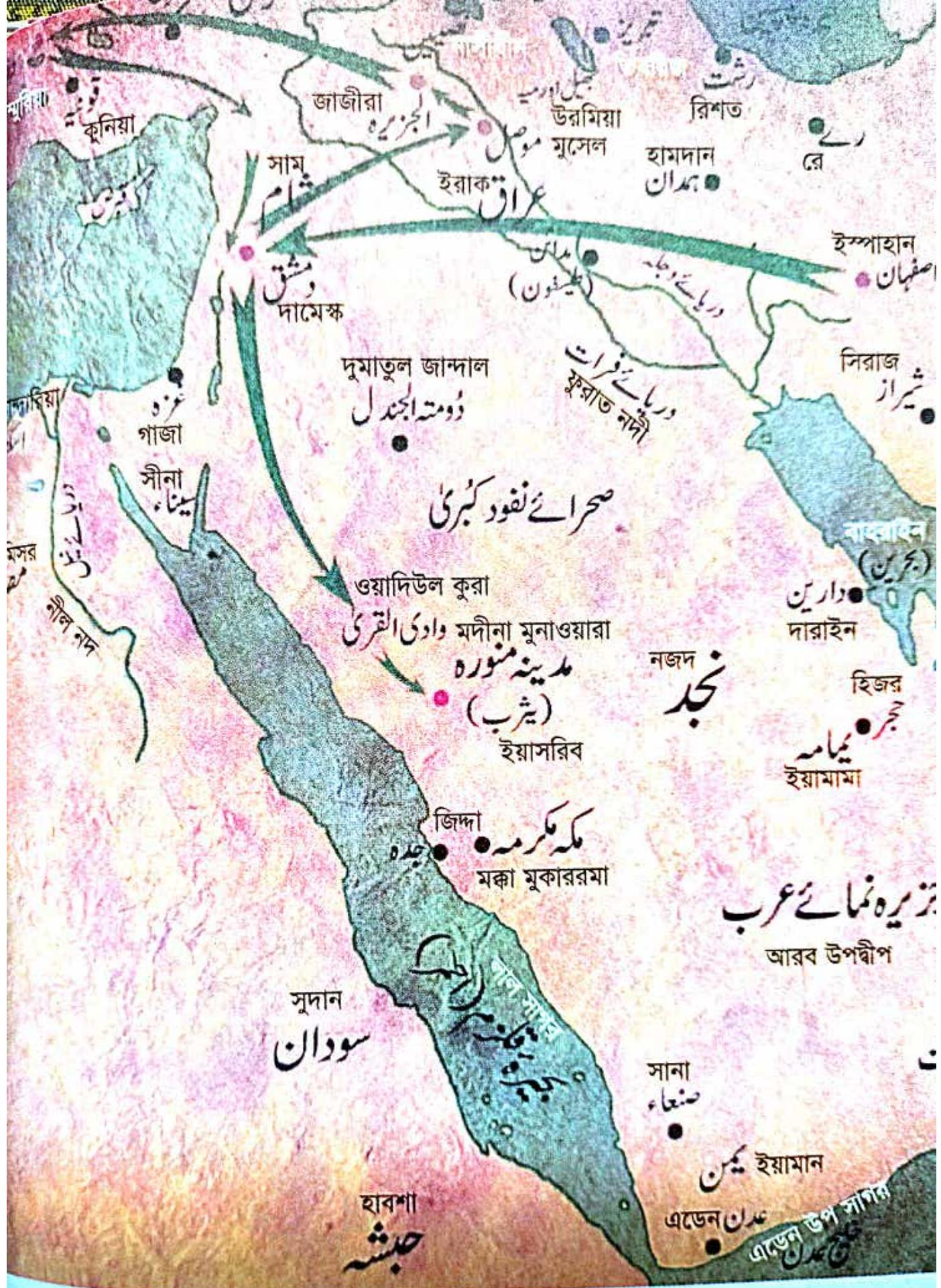
হযরত সালমান ফারেসী রাযি. এর সফর নকশা

- আম্মুরিয়া ● নাসীবীন ● মুসেল ● সাম ● ইস্পাহান
- মদীনা মুনাওয়ারা (ইয়াসরিব) ● ওয়াদিউল কুরা

সালমান রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে দেখতে লাগলেন। দরদর করে তাঁর গাল বেয়ে পড়তে লাগল আনন্দাশ্রু। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। পাঠ করলেন কালেমায়ে শাহাদত। তারপর চলে গেলেন মনিবের কাছে। মনিব বিষয়টি উপলব্ধি করে খেদমত আর কাজের চাপ বাড়িয়ে দিল। সাহাবীরা নবীজীর কাছে আসতেন, বসতেন; কিন্তু সালমানকে দাসত্ব আটকে রাখত। এমনকি বদর ও উহুদের যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে বঞ্চিত হলেন তিনি।

এই অবস্থা দেখে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সালমানকে বললেন, সালমান! তুমি তোমার মনিবের সাথে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার চুক্তি করো।

সালমান মনিবকে অনুরোধ করলেন চুক্তি করার জন্য। কিন্তু সে কঠোর অবস্থান নিল। সে শর্ত দিল, চল্লিশ আউন্স রুপা দিতে হবে; তিনশ' খেজুর গাছ লাগিয়ে দিতে হবে। চারা সংগ্রহ করে সেগুলো রোপন করতে হবে এবং সবগুলোই বাঁচতে হবে।

সালমান ইহুদীর শর্ত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। তখন নবীজী সাহাবীদেরকে বললেন–

তোমরা তোমাদের এই ভাইকে সাহায্য করো।

মুসলমানরা তাঁকে সাহায্য করলেন। যার যার বাগান থেকে সাধ্যমত তাঁরা চারা দিলেন। যখন চারা জমা হয়ে গেল, তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–

যাও সালমান! এগুলোর জন্য গর্ত খনন করো। গর্ত করা হয়ে গেলে আমার কাছে এসো। তুমি চারা রোপন কোরো না।

সালমান বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে গর্ত খনন শুরু করলেন। তিনশ' গর্ত খনন সম্পন্ন হয়ে গেল। সালমান রসুলুল্লাহকে বিষয়টি অবগত করলেন। সালমানের সাথে রওয়ানা হলেন তিনি। সাহাবীরা চারা এগিয়ে এগিয়ে দিলেন, রসুলুল্লাহ সেগুলো নিজ হাতে রোপন করলেন। সালমান বলেন, যেই সত্তার হাতে সালমানের প্রাণ, তাঁর কসম! সেই চারাগুলোর একটিও মরেনি।

যা হোক, এভাবে খেজুরগাছ লাগানোর শর্ত পূরণ হল। সালমানের যিম্মায় বাকি থাকল মালের চুক্তিটা। আচানক কোন এক যুদ্ধ থেকে রসূলুল্লাহর কাছে মুরগির ডিমের মত সোনা এল। তিনি সাহাবীদের দিকে লক্ষ করে বললেন—

মুকাতাবা চুক্তিকারী সালমানের খবর কী?

সাহাবীরা তাঁকে ডেকে নিলেন। নবীজী তাঁকে বললেন—

সালমান! এটি নিয়ে যাও এবং তোমার ঋণ আদায় করো।

সালমান সেটা নিলেন এবং ইহুদীর মাল পরিশোধ করে দিলেন। এভাবে আযাদ হয়ে গেলেন তিনি। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচর হয়ে গেলেন। নবীজীর এন্তেকাল পর্যন্ত আর কোথাও যাননি সালমান।
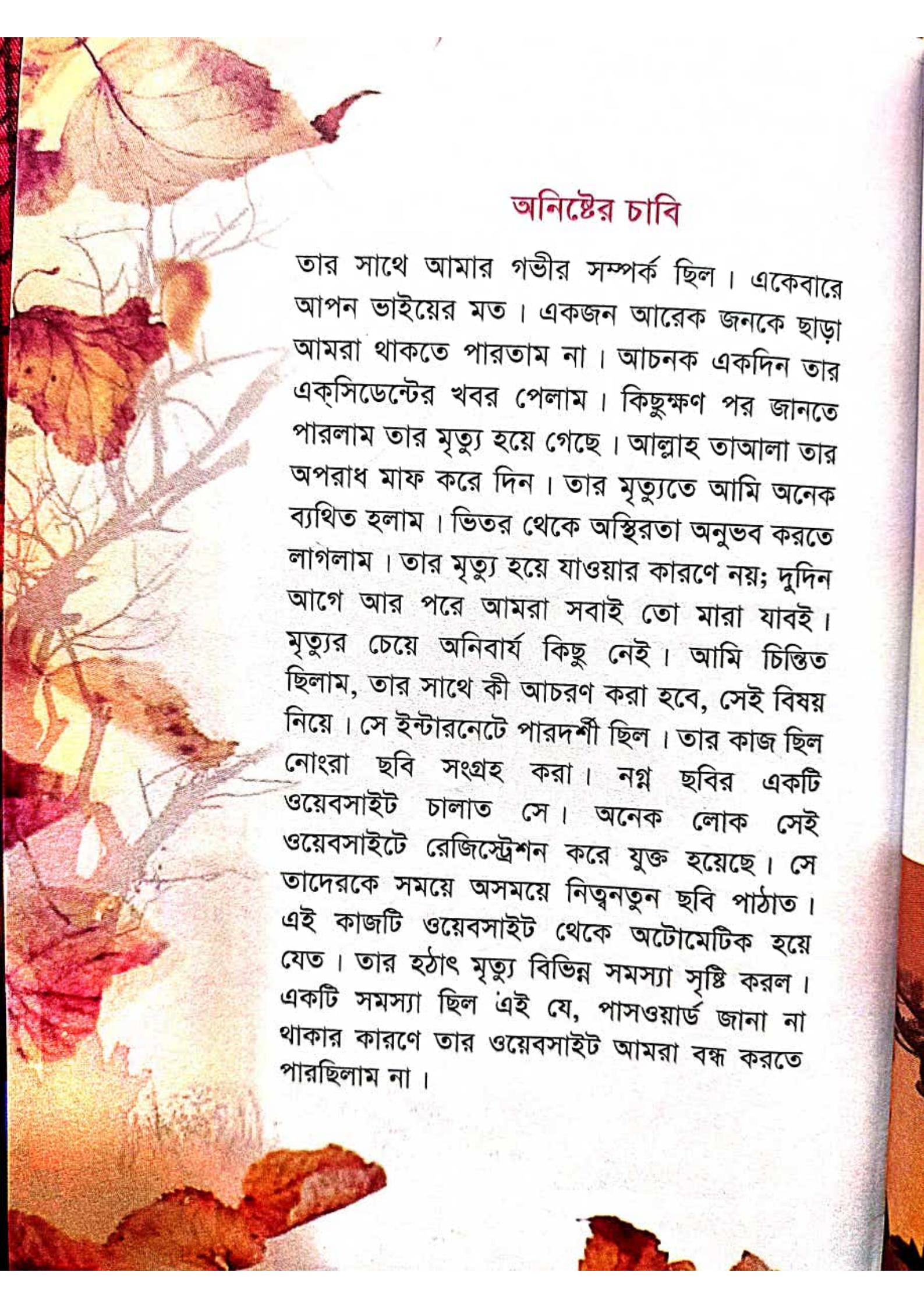
অনিষ্টের চাবি

তার সাথে আমার গভীর সম্পর্ক ছিল। একেবারে আপন ভাইয়ের মত। একজন আরেক জনকে ছাড়া আমরা থাকতে পারতাম না। আচনক একদিন তার এক্সিডেন্টের খবর পেলাম। কিছুক্ষণ পর জানতে পারলাম তার মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা তার অপরাধ মাফ করে দিন। তার মৃত্যুতে আমি অনেক ব্যথিত হলাম। ভিতর থেকে অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলাম। তার মৃত্যু হয়ে যাওয়ার কারণে নয়; দুদিন আগে আর পরে আমরা সবাই তো মারা যাবই। মৃত্যুর চেয়ে অনিবার্য কিছু নেই। আমি চিন্তিত ছিলাম, তার সাথে কী আচরণ করা হবে, সেই বিষয় নিয়ে। সে ইন্টারনেটে পারদর্শী ছিল। তার কাজ ছিল নোংরা ছবি সংগ্রহ করা। নগ্ন ছবির একটি ওয়েবসাইট চালাত সে। অনেক লোক সেই ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করে যুক্ত হয়েছে। সে তাদেরকে সময়ে অসময়ে নিত্বনতুন ছবি পাঠাত। এই কাজটি ওয়েবসাইট থেকে অটোমেটিক হয়ে যেত। তার হঠাৎ মৃত্যু বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করল। একটি সমস্যা ছিল এই যে, পাসওয়ার্ড জানা না থাকার কারণে তার ওয়েবসাইট আমরা বন্ধ করতে পারছিলাম না।

তার মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে যখন আমি চলছিলাম, তখন ভাবছিলাম যে, কবরে তার কী অবস্থা হবে? তার সামনে কোন্ জিনিস উপস্থিত করা হবে? নোংরা ছবিগুলো? এ রকম বিভিন্ন প্রশ্ন একের পর এক আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। ইতোমধ্যে আমরা কবরস্তানে পৌঁছে গেলাম। কবরস্তানের ঠান্ডা ও নিরিবিলি পরিবেশে ভীতি সঞ্চারিত হয়েছিল। অনেক দূর পর্যন্ত ছোট-বড় অসংখ্য লোকের কবর দেখা যাচ্ছিল। তার কবরের উপর দাঁড়িয়ে ছিল লোকজন। আমি তার কবরে উঁকি দিলাম। সাথে সাথে তার কবরে কী অবস্থা হতে পারে, তা নিয়ে ভাবলাম। কিছু কিছু লোককে আমি কাঁদতে দেখলাম। তখন আমি চিন্তা করলাম, এসব লোকের বিলাপ-ক্রন্দনে তার কী ফায়দা হবে?

আমরা তাকে দাফন করে দিলাম। তার কবরের অন্ধকার কুঠরি এবং ভয়ানক নির্জনতার কথা কল্পনা করতে করতে বাসায় এলাম। তার পরিবার ও কঠিন পরিশ্রম করে উপার্জনকৃত সম্পদ সবই ঘরে মজুদ ছিল; তার সঙ্গে গেছে শুধু তার আমল। তার আমল ছিল কী?

তার মা একদিন স্বপ্নে দেখলেন, অনেক কিশোর-তরুণ এসে তার কবরের উপর প্রস্রাব করছে। তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এর-ওর কাছে জিজ্ঞেস
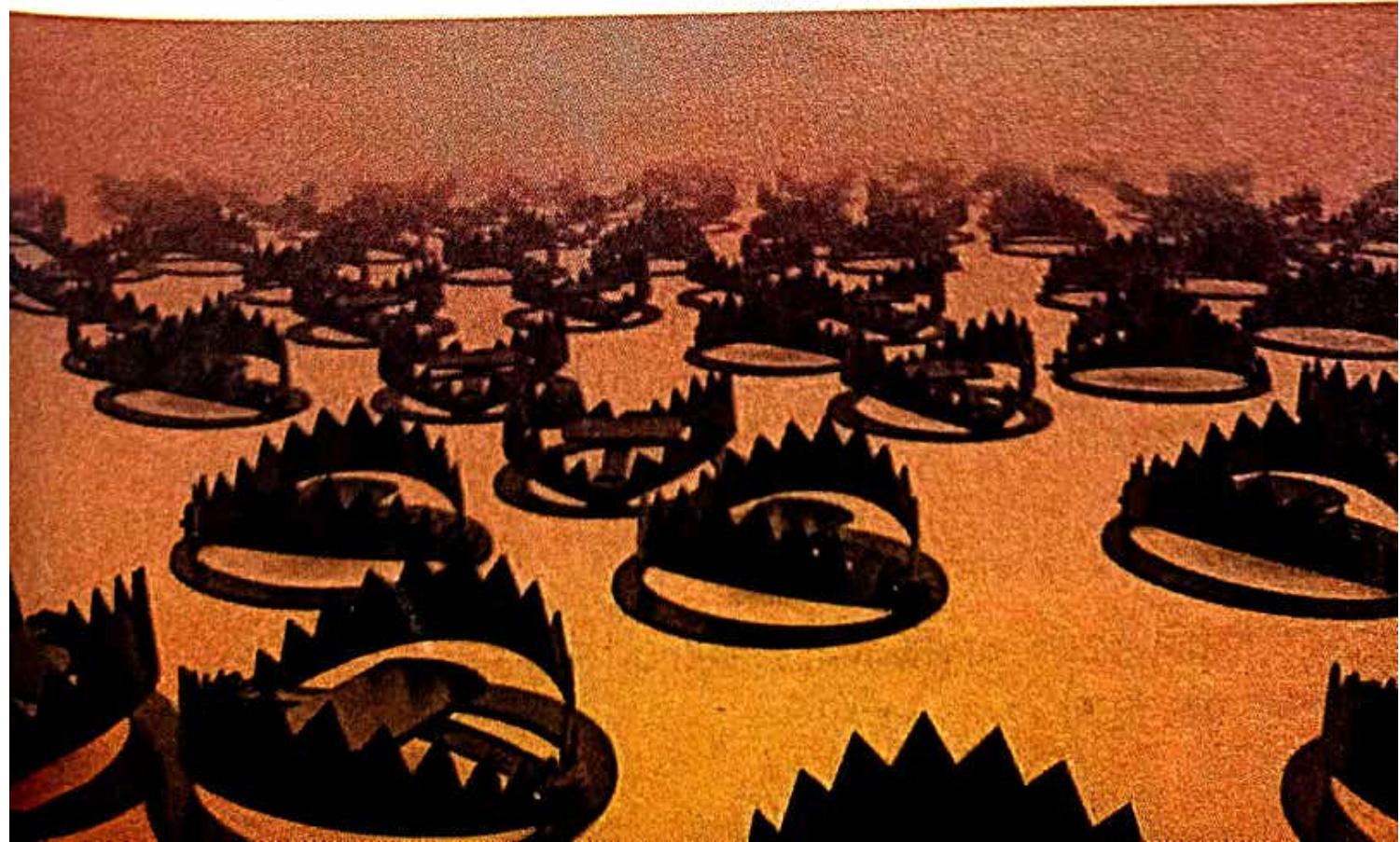
করে বেড়াতেন। দুঃখিনীর তো আসল হাকীকত জানা ছিল না। আমি এ ধরণের স্বপ্নের ব্যাপারে অনেক কিছু আলেমদের কাছে শুনেছিলাম। আমি চিন্তা করলাম, ব্যাখ্যার কী প্রয়োজন। স্বপ্ন একদম স্পষ্ট। যেসব কিশোর-তরুণ তার কবরে প্রস্রাব করছিল, তারা আর কেউ নয় ওইসব লোক, যাদের সে নোংরা ছবি পোস্ট করত এবং তারা আবার যার যার বন্ধু-বান্ধবের কাছে ওইসব ছবি পাঠিয়ে দিত। আফসোস! সে এসব লোকের গুনাহ কীভাবে বহন করবে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ
آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

যে ব্যক্তি কোন গুমরাহীর দিকে দাওয়াত দেয়, তার উপর গুনাহের ততটুকু ভার আরোপিত হবে, যতটা তার কথা শুনে গুনাহকারীদের উপর আরোপিত হবে। এর কারণে তাদের গুনাহ সামান্যও কমবে না।

আমি তার জন্য নেক কাজ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। তার ওয়েবসাইট বন্ধ করার জন্য ওয়েবসাইট নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করলাম। কিন্তু কোম্পানীর লোকজন অপারগতা প্রকাশ করলেন; তারা বরং আমার কথা শোনার পক্ষে ছিলেন না। কারণ, গোপন নম্বর আমি জানতাম না।

আমি অনেক কাকুতি-মিনতি করলাম; কিন্তু তারা আমার কোন কথা শুনলেন না।
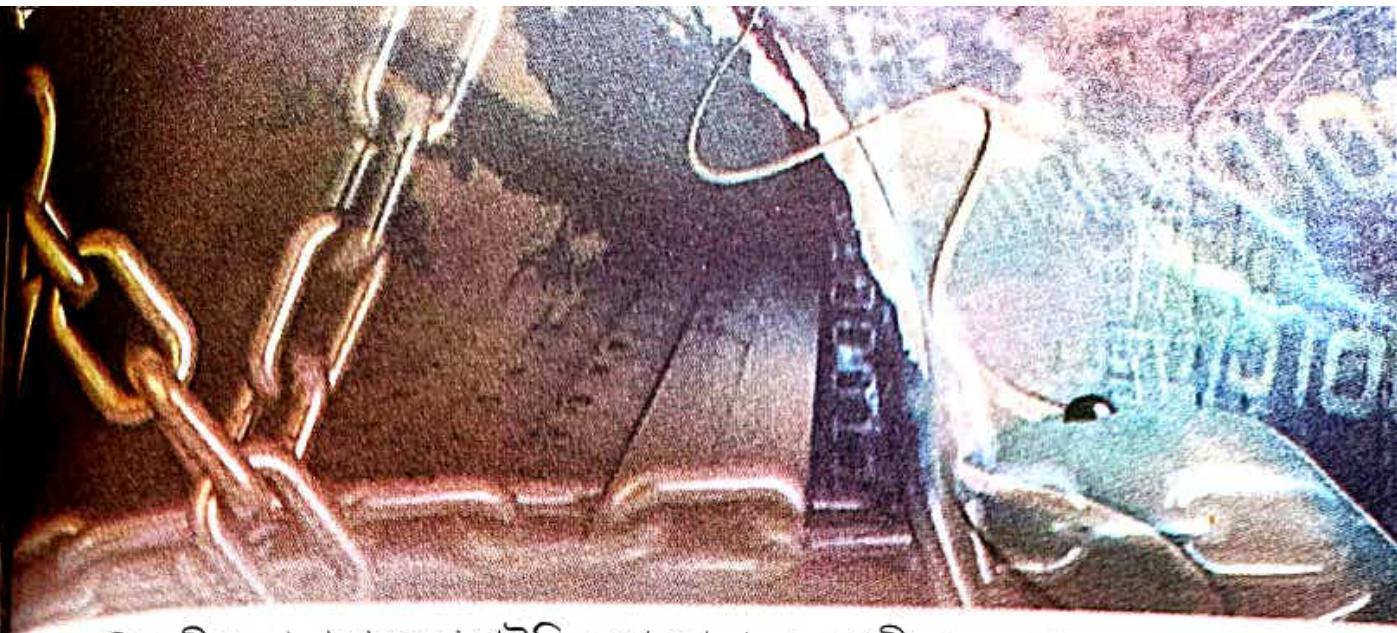
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস মনে পড়ে গেল আমার–

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ، مَغَالِيقَ لِلخَيْرِ.

নিশ্চয় কিছু লোক হচ্ছে অন্যায়ের চাবি এবং ন্যায়ের তালা।

আমি তাকে অনেক বোঝাতাম, তুমি অন্যদের গুনাহের বোঝা কীভাবে বহন করবে? অন্যায়ের চাবি হয়ে কিয়ামতের দিন পরের গুনাহ নিজের কাঁধে কীভাবে বইবে? কিন্তু তার মধ্যে এর কোন প্রতিক্রিয়া হত না। সে বলত, কেবল আমি যুবক। যখন বুড়ো হব, তখন তওবা করব। কিন্তু এগুলো সবই ধোঁকা। জীবনের ভরসা কতটুকু। মানুষ তো পানির বুদবুদের মত।

আল্লাহ মাফ করুন! না জানি, কত যুবক জীবনের ধোঁকায় লিপ্ত হয়ে গুনাহের পথে চলছে। আর আল্লাহই ভালো জানেন যে, কত তরুণী এই চোরাবালিতে ফেঁসে আছে?

লোকটি মারা গেছে; কিন্তু তার কর্মকাণ্ড কখনও শেষ হবে না। কিয়ামতের হুজুমের মধ্যে সমস্ত কৃতকর্মের জওয়াব দিতে হবে তাকে। যেসব ছবি সে অন্যদের কাছে প্রেরণ করত এবং দূরদূরান্ত পর্যন্ত নগ্নতা ছড়িয়ে দিত, সেই ছবিগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। আহ! এই অন্তহীন গুনাহের বোঝা না জানি, তাকে কত দিন বহন করতে হয়। আমি দোআ করছি, আল্লাহ তাকে মাফ করুন। আমীন।

বৃষ্টি হচ্ছিল না

মূসা আলাইহিস সালামের যুগে বনী ইসরাইল একবার অনাবৃষ্টিতে পড়েছিল। লোকজন সব মূসার কাছে এসে উপস্থিত হল। তারা বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে পরিতৃপ্ত করেন।

মূসা সবাইকে নিয়ে ময়দানে গেলেন। বনী ইসরাইলের তখন সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার বা তার চেয়ে কিছু বেশি। সবাই মূসা আলাইহিস সালামের সামনে বসে হাত তুলে দোআ শুরু করল। সবার এলোমেলো চুল, জীর্ণশীর্ণ অবস্থা; সবাই তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত। মূসা দোআ শুরু করলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও; তুমি আমাদের উপর রহমত করো। দুধের শিশু, ক্ষুধার্ত পশুপাখি আর দাড়িপাকা বুড়োদের অসিলায় আমাদের উপর মেহেরবানী করুন।

দোআর পর আকাশের রুক্ষতা ও সূর্যের তাপ আরও বৃদ্ধি পেল। তখন মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন।

আল্লাহ বললেন, আমি তোমাদেরকে কীভাবে বৃষ্টি দিব? তোমাদের মধ্যে এমন একজন লোক আছে, যে চল্লিশ বছর যাবৎ আমার না-ফরমানী করছে। তুমি ঘোষণা দাও। সে তোমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাক। আমি তার কারণেই বৃষ্টি দিচ্ছি না।

মূসা ঘোষণা দিলেন, হে ওই গুনাহগার বান্দা, যে চল্লিশ বছর থেকে আল্লাহর না-ফরমানী করছ! তুমি আমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে যাও। তোমার কারণে আমরা বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত।

গুনাহগার লোকটি ডানে-বামে লক্ষ করল। কেউ বের হল না। তখন সে বুঝল, তারই বের হতে হবে। সে মনে মনে বলল, এত মানুষের মধ্য থেকে এখন যদি আমি বের হই, তা হলে বনী ইসরাইলের সামনে অপদস্থ হই। আর যদি বসেই থাকি, তা হলে আমার কারণে এরা বৃষ্টি

থেকে বঞ্চিত থাকে। একথা চিন্তা করে তার দিল নরম হয়ে গেল। চোখে চলে এল অনুতাপের অশ্রু। কাপড় দিয়ে সে চেহারা ঢাকল। এরপর বলল, আল্লাহ! চল্লিশ বছর থেকে তোমার না-ফরমানী করছি; কিন্তু তুমি আমার অপরাধ আড়াল করে যাচ্ছ; আমাকে সুযোগ দিচ্ছ। আমি তোমার কাছে তওবা করলাম। তুমি আমাকে কবুল করো।

এভাবে সে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে থাকল।

তার মিনতি শেষ হওয়ার আগেই আকাশে মেঘ সাজল। তারপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হল। মূসা তাজ্জব হলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তোমার শুকর! তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়েছ; কিন্তু কেউ তো আমাদের মধ্য থেকে বের হয়নি।

আল্লাহ বললেন, মূসা! যার কারণে বৃষ্টি আটকে রেখে ছিলাম, তার কারণেই বৃষ্টি দিলাম। সে এখন তওবা করেছে।

মূসা বললেন, আল্লাহ! তোমার এই ভাগ্যবান বান্দাকে আমি দেখতে চাই।

আল্লাহ বললেন, যখন সে আমার না-ফরমানী করত, তখনই আমি তাকে অপদস্থ করিনি; এখন কি আমি তাকে অপদস্থ করব, যখন সে আনুগত্য করছে?

সাহসী যুবক

তোফায়েল ইবনে আমর ছিলেন তাঁর কবিলা দাউসে'র সর্বজনমান্য সরদার। কোন প্রয়োজনে তিনি একবার মক্কায় এলেন। তিনি যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন তাকে কুরাইশের নেতারা দেখে ফেলল। তারা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনি কে?

তিনি জওয়াব দিলেন, দাউস গোত্রের সরদার তোফায়েল ইবনে আমর। কুরাইশরা একে অপরের দিকে দেখল। তাদের ভয় হল যে, হয়তো তোফায়েল নবীজীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তিনি ইসলাম কবুল করবেন। যদি এমন হয়, তা হলে ইসলামে শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

কুরাইশরা তোফায়েলকে ঘিরে ধরল। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, এখানে মক্কায় এক লোক আছে, তার দাবি সে একজন নবী। তার সঙ্গে বসা এবং তার কথা শোনা থেকে বিরত থাকুন। সে একজন জাদুকর। আপনি যদি তার কথা শোনেন, তা হলে আপনার আকল বিগড়ে যাবে।

আরেক জন একই কথা বলল; বরং খানিকটা বাড়িয়ে বলল।

তারপর আরেক জন বলল এবং সে অনেক বেশি বলল।

তোফায়েল বলেন, আল্লাহর কসম! তারা এভাবে ভয় দেখাতে থাকল। এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি তার কোন কথা শুনব না এবং তার সাথে কথাও বলব না। এমন কি আমি কানের মধ্যে তুলার পুঁটুলি প্রবেশ করিয়ে দিলাম, তার পাশ দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার সময় কোন কথা কানে এসে পৌঁছে কি না, সেই ভয়ে।

এরপর আমি মসজিদে গেলাম। দেখলাম, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। আমি ধারেকাছে এক জায়গায় দাঁড়ালাম। আল্লাহ আমার কানে তাঁর কিছু কথা প্রবেশ করিয়েই দিলেন। আমি খুব চমৎকার কালাম শুনতে পেলাম। আমি মনে মনে বললাম, সর্বনাশ! আমি তো অবশ্যই একজন জ্ঞানী মানুষ।

ভালোমন্দ পরখ করতে পারি। তা হলে আমি এই লোকের কথা শুনব না কেন? তিনি যদি কোন ভালো কথা বলেন, সেটা আমি গ্রহণ করব। আর যদি মন্দ কথা বলেন, তা হলে আমি সেটা গ্রহণ করব না। আমি তাঁর নামায শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

নামায শেষ করে যখন তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, তখন আমি তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন, আমিও ভিতরে প্রবেশ করলাম। তাঁকে উদ্দেশ করে আমি বললাম, হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আমাকে আপনার ব্যাপারে এমন এমন কথা বলেছে। তারা আমাকে ভয় দেখাতে দেখাতে এ পর্যন্ত এনেছে যে, আমি আপনার কথা না শোনার জন্য নিজের কান বন্ধ করে ফেলেছি। কিন্তু আমি যে আপনার কাছ থেকে চমৎকার কথা শুনতে পেলাম। আপনি আমার কাছে আপনার বিষয়টি খুলে বলুন।

একথা শুনে নবীজী অভিভূত হলেন। খুশি হয়ে তোফায়েলের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করে শোনালেন। এরপর তোফায়েল বিষয়টি নিয়ে ভাবতে লাগলেন। লক্ষ করলেন যে, তিনি এমন জীবন যাপন করছেন, যেখানে তিনি প্রতিনিয়ত আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।
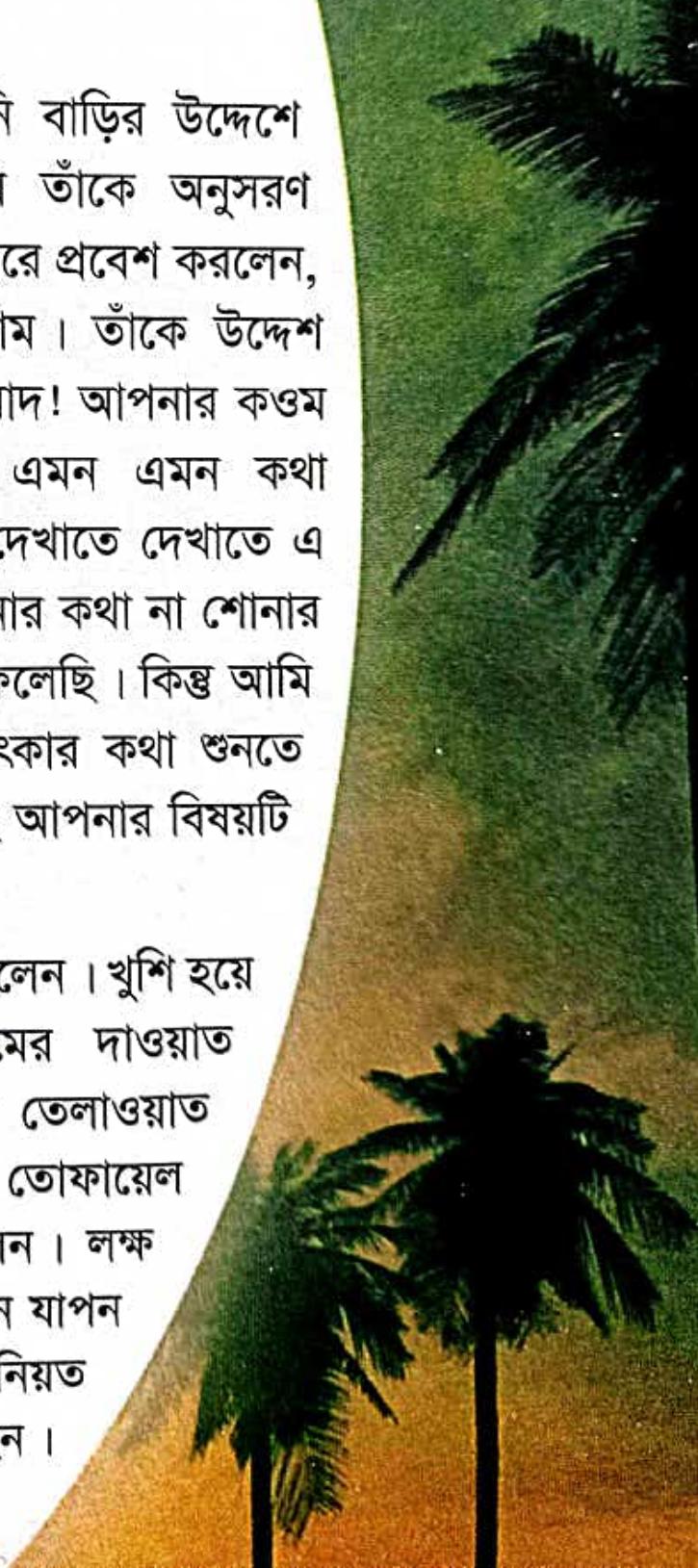
তিনি পাথর পূজা করেন, যা কোন ডাক শুনতে পায় না। ডাকলে সাড়া দেয় না। সত্য তার কাছে স্পষ্ট হতে লাগল।

তোফায়েল ইসলামের পরিণাম নিয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন, কীভাবে তিনি বাপদাদার ধর্ম বদল করবেন? লোকজন কী বলতে পারে? যে জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন, যেই সম্পদ তিনি গড়ে তুলেছেন– সব এলোমেলো হয়ে যাবে। এলোমেলো হয়ে যাবে পরিবার, সন্তান-সন্ততি, পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব– সবকিছু।

তোফায়েল নীরব হয়ে আবার ভাবতে লাগলেন। দুনিয়া ও আখেরাত পরিমাপ করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

হাঁ, তিনি অতিসত্বর সঠিক ধর্ম গ্রহণ করবেন। যার ইচ্ছা সে সন্তুষ্ট হোক, আর যার ইচ্ছা সে অসন্তুষ্ট হোক। যদি আসমানের অধিপতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তা হলে জমিনের লোকগুলো অসন্তুষ্ট হলে কী আসে যায়?

সম্পদ ও জীবিকার চাবি আসমানের অধিপতির হাতে। সুস্থতা ও অসুস্থতার চাবিও আসমানের অধিপতির হাতে। পদমর্যাদাও আসমানের অধিপতির হাতে। এমন কি জীবন-মরণও আসমানের অধিপতির হাতে।

সুতরাং যখন আসমানের মালিক খুশি হয়ে যাবেন, তখন দুনিয়ার কিছু খোয়া গেলে দুঃখ নেই। যখন আল্লাহ ভালোবাসবেন, তখন অন্যদের ক্রোধের কোন গুরুত্ব নেই। কেউ অপছন্দ করলে কিছু যায় আসে না। কেউ ঠাট্টা করলেও কিছু যায় আসে না।

হাঁ, তোফায়েল সেখানেই মুসলমান হয়ে গেলেন। কালিমায়ে শাহাদত পড়লেন তিনি।

এরপর তাঁর হিম্মত বেড়ে গেল। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার কওম আমাকে মান্য করে। আমি তাদের কাছে যাচ্ছি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য।
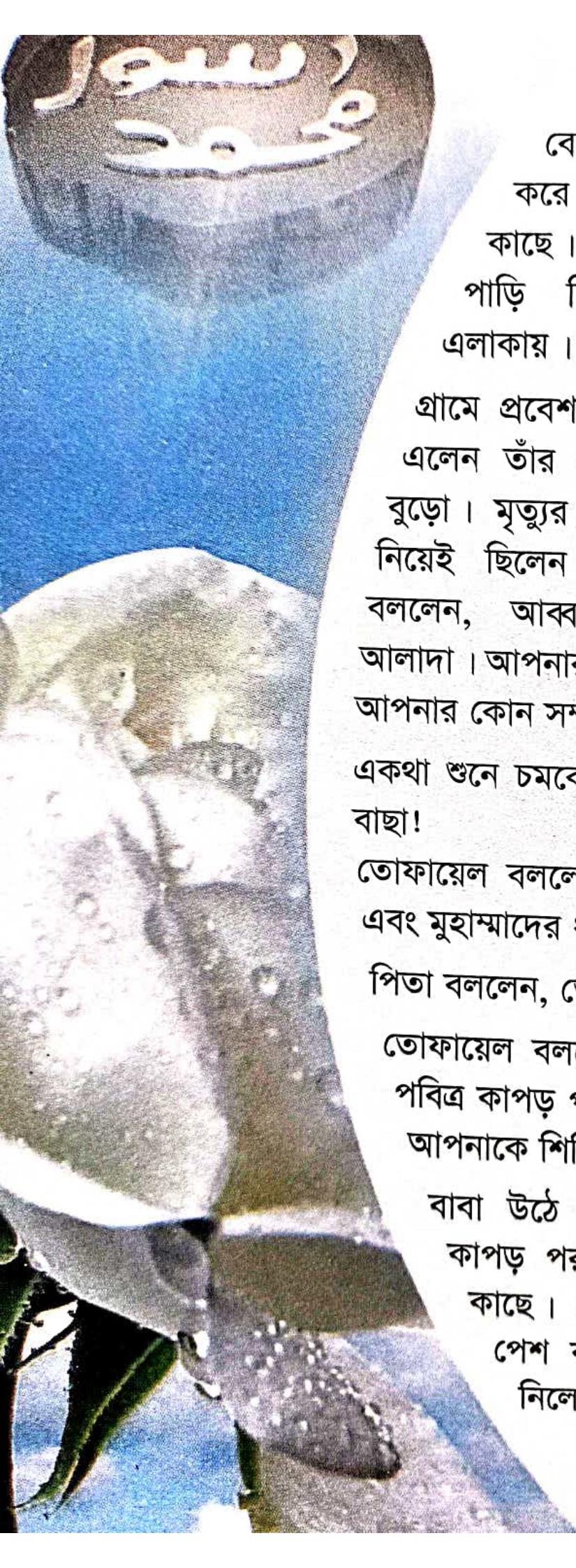
এরপর তোফায়েল মক্কা থেকে বের হলেন। এই দীনের গুরুত্ব বহন করে দ্রুত চলে গেলেন নিজ কওমের কাছে। পাহাড়-পর্বত, মরু-উপত্যকা পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলেন আপন এলাকায়।

গ্রামে প্রবেশ করার পর তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন তাঁর বাবা। তিনি ছিলেন একেবারে বুড়ো। মৃত্যুর দুয়ারে এসেও তিনি মূর্তিপূজা নিয়েই ছিলেন। তোফায়েল পিতার উদ্দেশে বললেন, আব্বাজান! আপনি এখন থেকে আলাদা। আপনার সাথে আমার এবং আমার সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।

একথা শুনে চমকে উঠলেন বাবা। বললেন, কেন বাছা!

তোফায়েল বললেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মাদের ধর্মে দীক্ষা নিয়েছি।

পিতা বললেন, তোমার ধর্মই আমার ধর্ম।

তোফায়েল বললেন, ঠিক আছে, গোসল করে পবিত্র কাপড় পরে নিন। আমি যা শিখেছি, তা আপনাকে শিখিয়ে দিব।

বাবা উঠে গেলেন। গোসল করে পবিত্র কাপড় পরলেন। তারপর এলেন ছেলের কাছে। তোফায়েল তার কাছে ইসলাম পেশ করলেন, তিনি তা কবুল করে নিলেন।

এরপর তোফায়েল নিজের ঘরে গেলেন। স্বাগত জানানোর জন্য স্ত্রী এগিয়ে এলেন। তোফায়েল বললেন, তুমি আমার থেকে দূরে থাকো। কারণ, তোমার সাথে আমার এবং আমার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

স্ত্রী বললেন, আপনি একথা বলছেন কেন?

তোফায়েল বললেন, ইসলাম আমার ও তোমার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমি মুহাম্মাদের ধর্মে দীক্ষা নিয়েছি।

স্ত্রী বললেন, আপনার ধর্মই আমার ধর্ম।

তোফায়েল বললেন, তা হলে গোসল করে পবিত্র হয়ে আসো।

দাউস কবীলার একটি দেবতা ছিল। তার নাম ছিল যুশ্‌শিরা। কওমের লোকজন এই দেবতাকে খুব সম্মান করত। তারা মনে করত, কেউ এই দেবতার উপাসনা ছেড়ে দিলে দেবতা তার প্রতিশোধ নেয়। তোফায়েলের স্ত্রী ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে হয়তো যুশ্‌শিরা তার ও তার ছেলেমেয়ের ক্ষতিসাধন করবে। এজন্য তিনি গোসল করতে গিয়ে ফিরে এলেন। বললেন, আমার মা-বাবা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন,
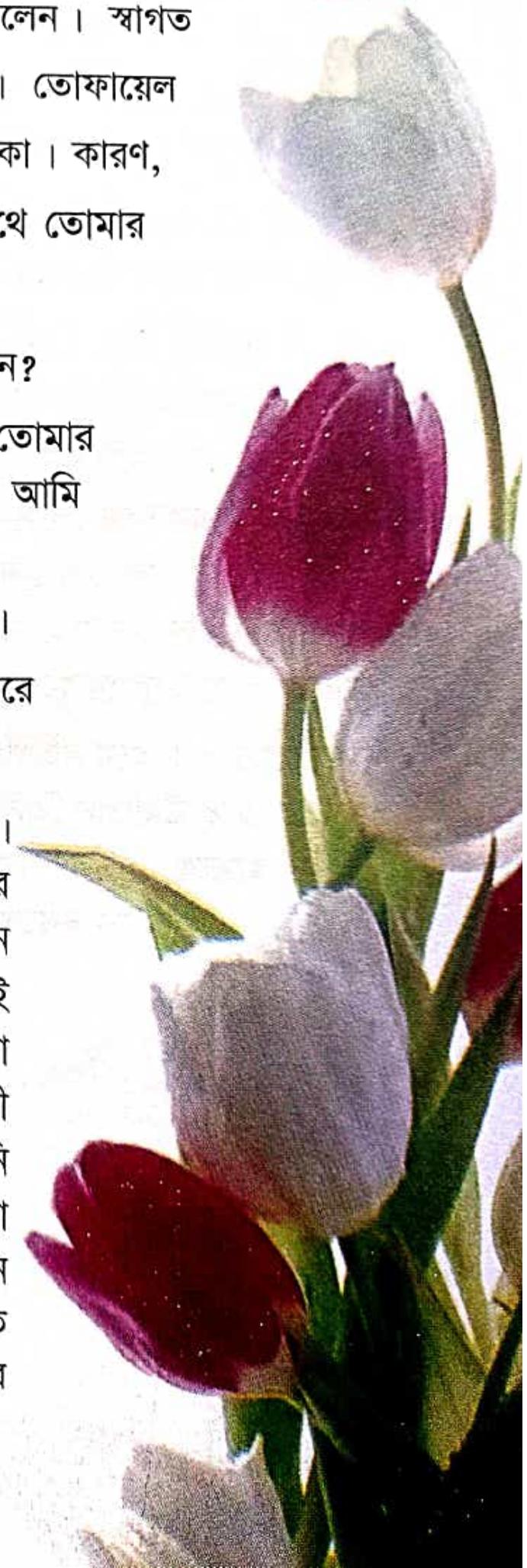
আপনি কি বাচ্চাদের জন্য যুশ্‌শিরা দেবতার অনিষ্টকে ভয় করেন না?

তোফায়েল বললেন, তুমি যাও। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যুশ্‌শিরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

স্ত্রী গিয়ে গোসল করলেন। তারপর তোফায়েল তার কাছে ইসলাম পেশ করলে তিনি তা কবুল করলেন।

এরপর তোফায়েল ঘরে ঘরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। সভাকক্ষে গিয়ে দাওয়াত দিলেন; রাস্তায় রাস্তায় দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা মূর্তিপূজা ছাড়তে রাজি হল না। এতে তোফায়েল ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি চলে গেলেন মক্কায়। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! দাউস কবিলা বিরোধিতা করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি তাদের প্রতি বদদোআ করুন।

তোফায়েলের কথা শুনে নবীজীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আসমানের দিকে হাত উঠালেন তিনি। তোফায়েল মনে মনে বললেন, কাজ হয়েছে, দাউস কবিলা ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! দয়ার নবীকে বলতে শোনা গেল–

হে আল্লাহ! দাউসকে তুমি হেদায়েত দাও। হে আল্লাহ! দাউসকে তুমি হেদায়েত দাও।

এরপর তিনি তোফায়েলের দিকে লক্ষ্য করে বললেন–

নিজ কওমের কাছে ফিরে যাও। দাওয়াত দাও তাদেরকে এবং তাদের সাথে নরম আচরণ করো।

তোফায়েল নিজ এলাকায় চলে গেলেন। লাগাতার দাওয়াত দিতে থাকলেন তাদেরকে। একসময় তারা মুসলমান হয়ে গেল।

সময় গড়িয়ে যেতে থাকে। নবীজী এন্তেকাল করেন। ইসলাম ধর্মের উপর থাকেন তোফায়েল। তারপর ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান।

জান্নাতের পথিক

যুবকের বয়স হয়েছিল মাত্র ষোলো বছর। অভ্যাস অনুযায়ী একদিন নামাযের আগে মসজিদে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছিল সে। অপেক্ষা করছিল একামতের জন্য। একামত শুরু হয়ে গেলে কুরআন শরীফ যথাস্থানে রেখে কাতারে শামিল হওয়ার জন্য দাঁড়াল। কিন্তু আচানক বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কয়েকজন মুসল্লী তাকে উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন।

যে ডাক্তার যুবকের নিরীক্ষণ করছিলেন, তিনি আমাকে ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছিলেন, এই যুবককে মৃতের মত অবস্থায় আমাদের কাছে আনা হল। আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখলাম, যুবকের হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হয়েছে। এই আক্রমণটি এত তীব্র ছিল যে, কোন উট এমন আক্রমণের শিকার হলে দ্বিতীয় শ্বাস নিতে পারত না। আমি যখন যুবককে পরখ করছিলাম, তখন সে মৃত্যুকে হাতছানি দিচ্ছিল; শ্বাস-প্রশ্বাসকে বিদায় জানাচ্ছিল। আমরা তাকে বাঁচাতে এবং হৃদযন্ত্রণা কমাতে চেষ্টা করছিলাম। যে ডাক্তার তার চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন, তিনি কিছু যন্ত্রপাতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি খুব দ্রুত সেইসব যন্ত্রপাতি উপস্থিত করে দিলাম। সেগুলো নিয়ে এসে দেখি, যুবক ডাক্তারের হাত ধরে আছে এবং ডাক্তার যুবকের মুখে নিজের কান লাগিয়ে রেখেছেন। আস্তে আস্তে যুবক কী যেন বলছিল। এই দৃশ্য দেখছিলাম আমি।

আচানক যুবক ডাক্তারের হাত ছেড়ে দিল। ডান দিকে পাশ পরিবর্তনের চেষ্টা করল এবং ধরা গলায় বলতে লাগল–

أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ... وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

এই কালিমা সে কয়েক বার বলল। নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল তার পাল্স। থেমে যাচ্ছিল হৃদকম্প। আমরা তাকে বাঁচাতে জোরদার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তকদীরের কাছে তদবীর ব্যর্থ হয়ে গেল। যুবক ইহজীবনকে বিদায় জানাল এবং তার রূহ দেহের খাঁচা থেকে উড়ে গেল।

কর্তব্যরত ডাক্তার কাঁদতে লাগলেন। অঝোরে কাঁদতে থাকলেন। এমন কি তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতেও পারলেন না। আমরা তাজ্জব হলাম। আমরা বললাম, ডাক্তার সাহেব! আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন? আপনার সামনে এই তো কারও প্রথম মৃত্যু নয়?

কিন্তু ডাক্তার অঝোরে কাঁদতেই থাকলেন। যখন তাঁর কান্না বন্ধ হল, তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই যুবক আপনাকে কী বলছিল?

ডাক্তার বললেন, যুবক কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল। চোখ খুলে সে ডানে-বামে দেখল। তখন সে বুঝে ফেলল, তাকে কোথায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সে আমাকে এবং হৃদরোগবিশেষজ্ঞকে দেখে বলল, ডাক্তার সাহেব! আপনি বিশেষজ্ঞকে বলে দিন যে, খামখা কষ্ট করে লাভ নেই। আমি বাঁচব না। আমার মৃত্যুর সময় এসে পড়েছে। আল্লাহর কসম! আমি এখন জান্নাতে নিজের জায়গা দেখতে পাচ্ছি।

মৃত্যুর বিছানায়

নিজেই নিজের কাহিনী বলতে গিয়ে সে বলল, এখন আমার কোন দিন কান্নামুক্ত যায় না। দিনে কত বার যে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হই, তার ইয়ত্তা নেই। জীবন আমার সঙ্গ দিতে চায় না। প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যু কামনা করি। ইস! আমার যদি জন্মই না হত; আমি যদি এই দুনিয়া না চিনতাম।

আমার কাহিনীর শুরু এক বান্ধবীকে দিয়ে। একদিন সে আমাকে তার বাসায় ডেকে নিল। যারা অতিমাত্রায় ইন্টারনেট ব্যবহার করে, আমার এই বান্ধবী তাদের একজন। সে আমাকে ইন্টারনেট সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য উৎসাহ দিল। কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়, তাও শেখানো আরম্ভ করল সে। ফলে তার সাথে বেশি বেশি দেখা করার সুযোগ হয়ে গেল।

মাত্র দুই মাসের মধ্যেই আমি ইন্টারনেটে খোশগল্প করার ব্যাপারে দক্ষ হয়ে গেলাম। ই-মেইল পাঠানো এবং সিদ্ধ-অসিদ্ধ সব ধরণের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করাও শিখে ফেললাম আমি।

আমার স্বামী যেন ঘরে ইন্টারনেট লাগিয়ে দেন, সেজন্য এই দুই মাস তাঁর সাথে বাগযুদ্ধ চলতে থাকল। তিনি এর খুব বিরোধী ছিলেন। শেষে একথা বলে তাঁকে সম্মত করলাম যে, বাসায় একা থাকতে বিরক্ত লাগে। আমার বান্ধবীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আমি কেন ইন্টারনেটে কথা বলব না, যার খরচ টেলিফোনের চেয়ে অনেক কম?

আমার স্বামী আমার কথা মেনে নিলেন। ইস! তিনি যদি না মানতেন। এখন থেকে আমার পুরো দিন বান্ধবীদের চ্যাটিং-এ অতিবাহিত হতে লাগল। এরপর থেকে আমার স্বামী আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ ও আবদার থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। যখনই তিনি বাসা থেকে বের হতেন, তখনই আমি পাগলের মত গিয়ে ইন্টারনেট খুলে বসতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। মনে মনে চাইতাম, আমার স্বামী যেন আরও বেশি সময় বাইরে থাকেন। আমি তাঁকে ভালোবাসতাম। তিনিও আমার ভালোবাসার মূল্যায়ন করতেন। আর্থিক অবস্থা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সম্ভাব্য সমস্ত পন্থায়ই আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। যতই দিন যেতে থাকল, ততই ইন্টারনেটের ব্যাপারে আমার মনোযোগ বাড়তে থাকল। এমন অবস্থা হল যে, ইন্টারনেট ছাড়া আর কোনকিছুই ভালো লাগত না। আগে দুই সপ্তাহ পর বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যেতাম। এখন তা-ও বন্ধ হয়ে গেল।

যখন আমার স্বামী বাসায় পৌছতেন, তখন সাথে সাথে নেটের ফাইলগুলো বন্ধ করে দিতাম। এতে তিনি আশ্চর্য হতেন। এতে তিনি সন্দেহ করতেন না; তবে আমি ইন্টারনেটে কী করি, সেটা দেখার আগ্রহ তাঁর মধ্যে সৃষ্টি হয়। একদিন হয়তো তাঁর আগেভাগে ছুটি হয়ে গিয়েছিল; অথবা তিনি আমাকে যাচাই করার জন্য আগে এসে পড়েছিলেন।

এমনভাবে তিনি বাসায় প্রবেশ করলেন যে, সামলে সারতে পারলাম না। তিনি আমার চ্যাটিং দেখে ফেললেন, যা আমি বন্ধ করতে পারিনি। তিনি শুধু অভিযোগের সুরে বললেন, ইন্টারনেটে জানবার অনেক কিছু আছে; তবে একে সময় নষ্ট করার মাধ্যম বানানো উচিত নয়।

সময় গড়াতে থাকল। আমি চ্যাটিঙের ফেতনায় আরও বেশি গ্রেফতার হতে থাকলাম। বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব পরিচারিকার কাঁধে ছেড়ে দিলাম। আগে যখন আমার স্বামীর বাসায় ফেরার সময় হত, তখন সাজগোজ করে পরিপাটি হতাম। কিন্তু ইন্টারনেট আসার পর এই আমল আস্তে আস্তে একদম খতম হয়ে গেছে। আমি ইন্টারনেটে এতটাই আসক্ত হয়েছিলাম যে, স্বামী ঘুমিয়ে পড়ার পর চুপে চুপে কম্পিটারের কক্ষে চলে যেতাম এবং তাঁর জাগ্রত হওয়ার আগে শোয়ার কামরায় এসে পড়তাম। তিনি জানতেন যে, আমি ইন্টারনেটে যা করি, তা শুধু সময়ের অপচয়; কিন্তু আমার একাকিত্ব এবং পরিবার থেকে দূরে অবস্থানের কথা বিবেচনা করে তিনি স্নেহের আচরণ করতেন। আমি এই সুযোগে গলদ ফায়দা নিতে থাকি। ছেলেমেয়ে দেখার ক্ষেত্রে আমার উদাসীনতা লক্ষ করে তিনি খুব পেরেশান হতেন। কয়েকবার তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; কিন্তু আমি কান্নার ভান করে বলতাম,

আপনি তো জানেন না যে, আপনার অনুপস্থিতিতে বাচ্চারা কী কাণ্ড করে। আমি ওদের মানুষ করা নিয়ে চিন্তিত; কিন্তু ওরা আমাকে সঙ্কটে ফেলে রাখে।

যা হোক, স্বামী ও অন্যসব ব্যাপারে আমি বে-পরওয়া হয়ে গেলাম। আগে তিনি বাসার বাইরে গেলে দশ/পনেরো বার ফোন করতাম। কিন্তু ইন্টারনেট আসার পর একান্ত প্রয়োজনে এক/আধ বার ফোন করতাম। আমার স্বামী ইন্টারনেটের ব্যাপারে অনেক বিরক্ত হয়ে পড়লেন। এভাবে চলে গেল ছয় মাস। এর মধ্যে ছদ্ম নামের কিছু আইডির সাথে আমি যুক্ত হয়ে গেলাম। যে-ই আমার সাথে চ্যাটিং করতে চাইত, আমি তারই সাথে খোশগল্প জুড়ে দিতাম। আমি জানতামও যে, অপর প্রান্তের লোকটি পুরুষ; কিন্তু তারপরও আমি পুরুষদের সাথে নিঃসংকোচে চ্যাটিং করতে থাকি।

এক পুরুষের সাথে চ্যাটিং করতে গিয়ে আমি খুব মুগ্ধ হয়ে পড়লাম। তার কথাবার্তা আমার হৃদয় স্পর্শ করতে লাগল। পর্যায়ক্রমে এই সম্পর্ক বাড়তে থাকল এবং প্রায় তিনমাস পর্যন্ত ধাপের ধাপ এগোতে লাগল। তার মধুমাখা কণ্ঠ, প্রেম ও ভালোবাসার সংলাপে আমি ফেঁসে গেলাম।

অনেক সময় তার কথাবার্তা খুব সাধারণ হত; কিন্তু শয়তান সেগুলো খুবসুরত করে দেখাত। এতদিন পর্যন্ত আমাদের কথাবার্তা হত লেখার মাধ্যমে। একদিন সে আমার কণ্ঠ শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করল। আমি অস্বীকার করলাম। কিন্তু সে নাছোড় বান্দা। শেষে সে আমাকে চ্যাটিং এবং ই-মেইল যোগাযোগ বন্ধ করার হুমকি দিল।

আমি তার আবদার ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু কেন জানি ব্যর্থ হলাম। অবশেষে একবারই মাত্র কথা বলার শর্তে রাজি হলাম। তার প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে আমরা চ্যাটিঙের অডিও কল্ সিস্টেম ব্যবহার করলাম। যদিও সিস্টেমটি খুব ভালো ছিল না; তবুও তার কণ্ঠ খুব সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হল। সে বলল, ইন্টারনেটে আপনার কথা ভালো করে শোনা যাচ্ছে না; সুতরাং আপনার ফোন নাম্বার দিন।
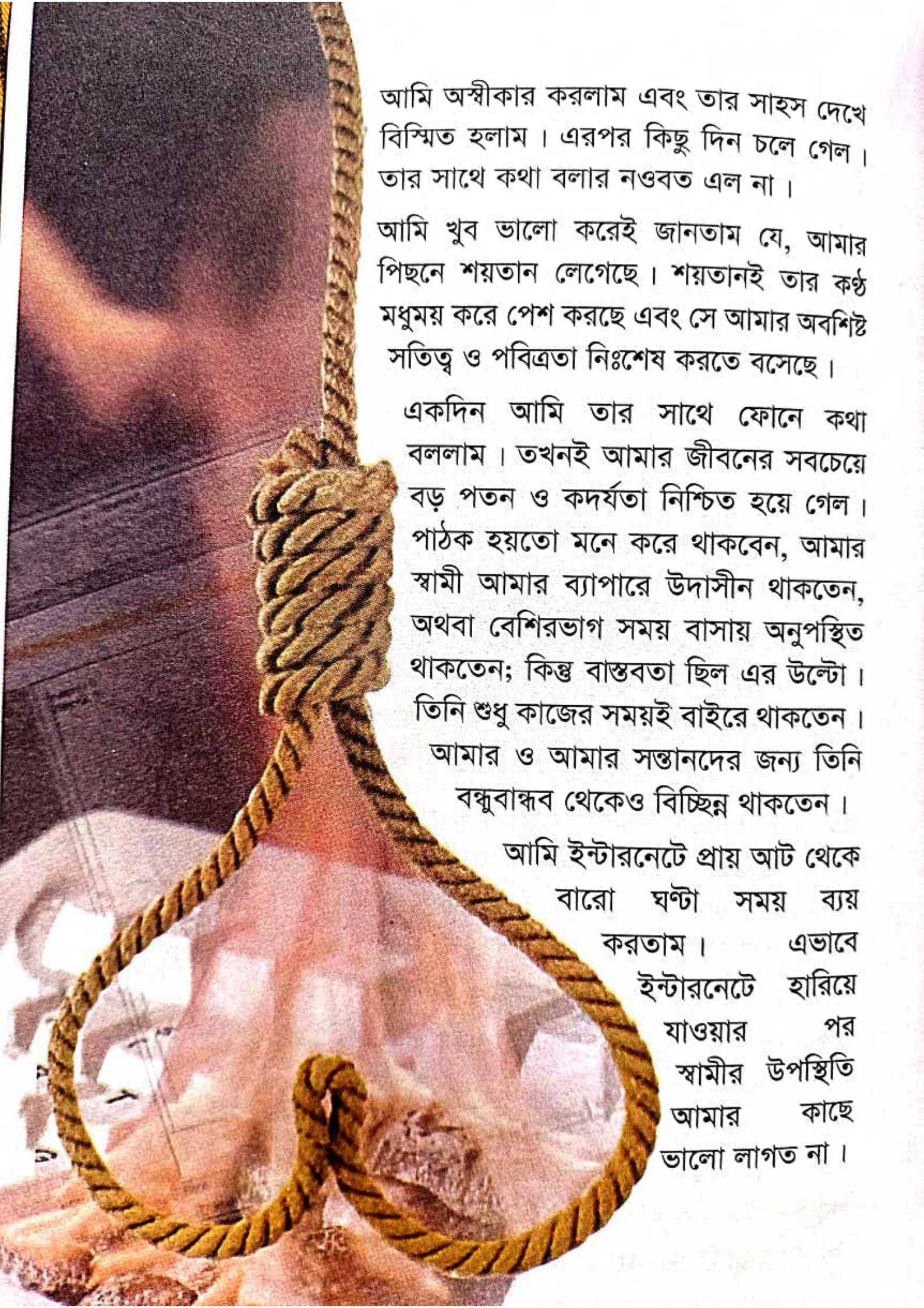
আমি অস্বীকার করলাম এবং তার সাহস দেখে বিস্মিত হলাম। এরপর কিছু দিন চলে গেল। তার সাথে কথা বলার নওবত এল না।

আমি খুব ভালো করেই জানতাম যে, আমার পিছনে শয়তান লেগেছে। শয়তানই তার কণ্ঠ মধুময় করে পেশ করছে এবং সে আমার অবশিষ্ট সতিত্ব ও পবিত্রতা নিঃশেষ করতে বসেছে।

একদিন আমি তার সাথে ফোনে কথা বললাম। তখনই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পতন ও কদর্যতা নিশ্চিত হয়ে গেল। পাঠক হয়তো মনে করে থাকবেন, আমার স্বামী আমার ব্যাপারে উদাসীন থাকতেন, অথবা বেশিরভাগ সময় বাসায় অনুপস্থিত থাকতেন; কিন্তু বাস্তবতা ছিল এর উল্টো। তিনি শুধু কাজের সময়ই বাইরে থাকতেন। আমার ও আমার সন্তানদের জন্য তিনি বন্ধুবান্ধব থেকেও বিচ্ছিন্ন থাকতেন।

আমি ইন্টারনেটে প্রায় আট থেকে বারো ঘণ্টা সময় ব্যয় করতাম। এভাবে ইন্টারনেটে হারিয়ে যাওয়ার পর স্বামীর উপস্থিতি আমার কাছে ভালো লাগত না।

বাসায় বেশি থাকার কারণে প্রায়ই আমি তাঁকে এটাসেটা বলতাম। তাকে উৎসাহ দিতাম যে, সন্ধ্যায়ও কোন কাজ যোগাড় করুন, যাতে বিপুল অংকের ঋণ ও কিস্তি থেকে প্রাণে রক্ষা পাওয়া যায়।

তিনি সত্যিই আমার কথার উপর আমল করলেন। একটি ছোট কারখানায় তাঁর এক বন্ধুর সাথে পার্টনার হলেন। এরপর আমার ইন্টারনেটে সময় দেওয়া আরও বেড়ে গেল। হাজার টাকার টেলিফোন বিল দেখে তিনি ঘাবড়ে যেতেন। এ ব্যাপারে আমার কোন অনুভূতিই ছিল না। অন্য দিকে সেই আজনবী ব্যক্তি আমার সাথে তার সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি করতে লাগল। আমার কণ্ঠ শোনার পর বার বার আমাকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকল সে। আমি তাকে তিরস্কার করলাম। আমি তাকে তিরস্কার করলাম বটে; কিন্তু আমি তাকে দেখার তীব্র আগ্রহ ভিতরে ভিতরে পুষতে লাগলাম। তারপরও সাক্ষাৎ এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। এর কারণ শুধু এটুকুই ছিল যে, ভিতরে এক প্রকার অজানা ভীতি কাজ করছিল।

অপর দিকে তার পীড়াপীড়ি দিনদিন বাড়তে থাকল। শেষ পর্যন্ত আমি তার এই আবদার মেনে নিলাম। তবে শর্ত দিলাম এই যে, এটাই হবে আমাদের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। এভাবে চুক্তি হওয়ার পর একটি মার্কেটে গিয়ে আমরা দেখা করলাম। আমরা ছিলাম দুই জন। আর তৃতীয়জন শয়তান ছাড়া আর কেউ ছিল না।

প্রথম দর্শনেই আমি তার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। শয়তান তাকে আমার চোখে খুব সুদর্শন করে দেখাল। আমার স্বামীও কম সুন্দর নন; কিন্তু শয়তানের কাজ হল হারামকে সুদর্শন করে পেশ করা।

সাক্ষাৎ সম্পন্ন হল। এরপর লোকটি আমার সাথে তার সম্পর্ক আরও বাড়াতে লাগল। আমি যে বিবাহিতা এবং কয়েকজন সন্তানের জননী, সে কথা প্রথম দিকে জানত না সে। কয়েক বার সে আমাকে দেখে এবং খুব মিহিন কথাবার্তা বলে। আমার ব্যাপারে সব কথা জেনে নেয়। তারপর সে আমাকে স্বামীর ব্যাপারে ক্ষিপ্ত করতে থাকে। একদিন সে স্বামীকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিল। আমি নিজের

স্বামীকে ঘৃণা করতে লাগলাম। নিত্বনতুন ঝামেলা ও ঝগড়া সৃষ্টি করতে লাগলাম। যাতে তিনি আমাকে নিজ থেকেই তালাক দিয়ে দেন। আমার স্বামী জটিলতা নিরসন করতে না পেরে বাসা থেকে গায়েব থাকতে আরম্ভ করলেন। এরপর খুব ভয়ানক ঘটনা ঘটল।

একদিন আমার স্বামী বললেন, তিনি জরুরী কাজে পাঁচ দিনে সফরে যাচ্ছেন। বাচ্চাদেরকে নিয়ে তিনি আমাকে পিত্রালয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি সুবর্ণ সুযোগ মনে করলাম। পিত্রালয়ে যেতে অস্বীকার করলাম। তিনি অপারগ হয়ে শুক্রবারে সফরে চলে গেলেন। অন্যদিকে রবিবারে আমাদের সাক্ষাতের দিন ধার্য ছিল। আমি শয়তানের হাত ধরে চুপচাপ একটি বাজারে গিয়ে তার সামনে উপস্থিত হলাম। চড়ে বসলাম তার গাড়িতে। বিভিন্ন সড়কে গাড়ি দৌড়াতে লাগল সে।

একজন আজনবীর সাথে এই জীবনের প্রথম ঘর থেকে বের হয়েছিলাম। আমার পেরেশানীর অন্ত ছিল না। আমি তাকে বললাম, বেশিক্ষণ দেরি করতে চাই না। ভয় হচ্ছে স্বামী যদি আবার বাসায় পৌঁছে যান, অথবা কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। সে বলল, তোমার স্বামী যদি আজকের এই ঘটনা জানতে পারেন, তা হলে তিনি নিজ থেকে তালাক দিয়ে দিবেন। এভাবে তুমি তার থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। এখন তার কথা ও কণ্ঠ ভালো লাগছিল না। আমার ভয় বাড়তে লাগল। আমি তাকে আবারও বললাম, বেশি দূর যাবেন না। আমি বাসায় পৌঁছতে লেট করতে চাই না। সে আমাকে এদিক ওদিক কথা বলে ব্যস্ত রাখতে লাগল।

আচানক আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি অপরিচিত জায়গায় এসে পৌঁছলাম। এটা হয়তো কোন রেস্ট হাউস হবে। আমি চেঁচাতে লাগলাম, এটা কোথায়? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

গাড়ি থামল। একজন লোক এসে দরজা খুলে দিল। সে টেনে হিঁচড়ে বের করল আমাকে এবং কিছু দূর গিয়ে একটি কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। সেখানে আগে দু'জন লোক বসে ছিল। একদিক থেকে খুব

মোহনীয় সুগন্ধ আসছিল। সবকিছু আমার উপর বিদ্যুৎ হয়ে পতিত হচ্ছিল। আমি অনেক চিৎকার করলাম এবং তার কাছে দয়া করার জন্য অনুরোধ করলাম; কিন্তু আমার অনুরোধ অট্টহাসির মধ্যে মিলিয়ে গেল।

অচেনা জায়গায় ভয়ের তীব্রতার কারণে চারপাশের অবস্থা বুঝতে ব্যর্থ ছিলাম। আচানক আমার গালে একটি থাপ্পড় পড়ল। তারপর বিকট এক গর্জন শোনা গেল। সেই গর্জন শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেললাম ভয়ে। তারপর যা হওয়ার ছিল, হল। যখন আমার হুঁশ এল, তখন আমি ভয়ে একেবারে জড়োসড়ো। শরীর কাঁপছিল। কান্না থামছিল না। তারা কাপড় দিয়ে আমার চোখ বাঁধল। গাড়িতে তুলল এবং আমার বাসার কাছে এক জায়গায় ফেলে দিয়ে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি নিজের বাসায় প্রবেশ করলাম। কেঁদে কেঁদে চোখের পানি শুকিয়ে ফেললাম এবং নিজেকে বন্দী করে ফেললাম একটি কামরায়। বাচ্চাদেরকেও দেখলাম না; মুখে কোন খাবারও পুরলাম না।

নিজের উপর প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি হল। আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলাম। সফল হতে পারলাম না। সন্তানাদির খবর নেওয়ার জ্ঞানও আমার থাকল না। আমার স্বামী সফর থেকে ফিরে এলেন। আমার অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে, পায়ে ভর করে হাঁটতেও পারছিলাম না। তিনি আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন।
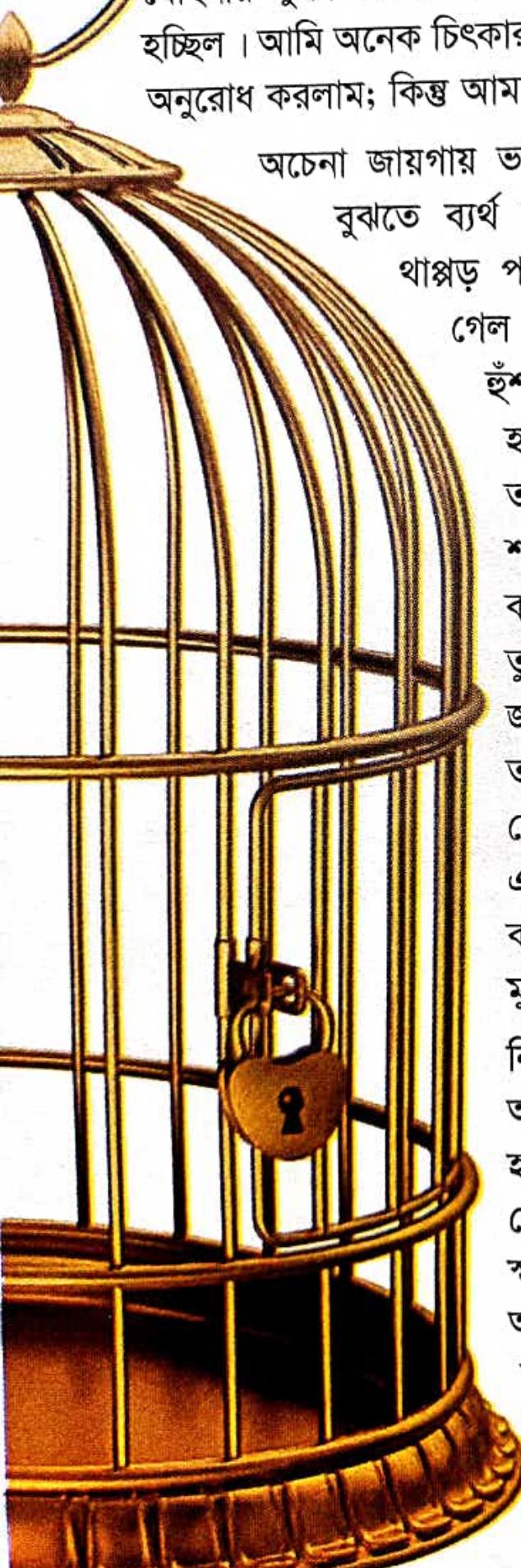
ডাক্তাররা আমাকে স্বস্তি ও শক্তি বর্ধনের ওষুধপত্র দিলেন। আমি স্বামীকে বললাম, তাড়াতাড়ি আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন।

আমি খুব কাঁদছিলাম। পরিবারের লোকজন কিছুই করতে পারছিল না। তারা ধারণা করছিল, স্বামীর সাথে আমার কোন মনমালিন্য হয়েছে। আমার পিতা আমার স্বামীর সাথে সমোঝতা করাতে চাইলেন। তারা কোন ফল বের করতে পারল না। আমার স্বামী বা অন্যকেউ কিছু জানত না যে, আমার উপর দিয়ে কেমন কিয়ামত অতিবাহিত হয়েছে। পরিবারের লোকজন আমাকে কয়েকজন আমেলের কাছেও নিয়ে গেল। আমি নীরব ছিলাম। আমার উপর দিয়ে কী অতিবাহিত হয়েছে, তার কী বলব, কীভাবে বলব?

আমি এখন স্বামীর জন্য উপযুক্ত নই। আমি তাঁর কাছে তালাক চাইলাম। কেননা, আমি ভদ্রসমাজে থাকবার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছি। আমি নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছি।

চ্যাটিঙের মাধ্যমে যারা বন্ধু হয়, তারা চ্যাটিঙে লিপ্ত তরুণীদেরকে শিকার করে। এই পাঁজি লোকেরা তরুণীদেরকে অন্ধকার কুঠরিতে টেনে নিয়ে যায় এবং একরাতের রানি বানায়। তারপর তাদেরকে জীবিত দাফন করার জন্য কোন বিরান ভূমিতে ফেলে চয়ে যায়। আমার অবস্থা দেখে আমার স্বামী খুব ব্যথিত হলেন। কয়েক দিন কাজে না গিয়ে আমার কাছে বসে থাকলেন। আমাকে তালাক দিতে অস্বীকার করলেন তিনি। বেচারা আমাকে অনেক ভালোবাসতেন। নিজের বাসা বানাতে গিয়ে পরিশ্রম করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তালাক দিয়ে সংসার উজাড় করতে তিনি রাজি নন।

আমি গোপন রহস্য নিজের বুকে লুকিয়ে ফেললাম। যতই দিন যাচ্ছে, আমার দুঃখ আর দুশ্চিন্তা বেড়েই চলছে। আমার হৃদয় রক্তাক্ত। আমি কেমন বদমাশদের হাতে পড়েছিলাম, সে কথা ভাবলে দম বন্ধ হয়ে আসে। কত অপমানের মুখোমুখি হয়েছিলাম আমি। কেমন মদ্যপ ও যেনাকারদের খেলনা হয়েছিলাম আমি। কেমন পাগল হয়েছিলাম।

উফ! আমি মূল্যবান কত সময় বদমাশদের সাথে চ্যাটিং করে বরবাদ করেছি, যাদেরকে কোন ভদ্র মানুষ দেখতেও রাজি হবেন না। একদম সত্য কথা, খারাপের পরিণতি সবসময় খারাপ হয় এবং রক্তের অশ্রুতে ভাসায়।

এখন আমি নিজের কাহিনী এমন অবস্থায় লিখছি, যখন মৃত্যুর বিছানায় পড়ে আছি। আহ! নফস ও শয়তানের জালে ধরা পড়া এক অসহায় নারী এখন মৃত্যুর পদধ্বণি শুনতে পাচ্ছে। ইস! যদি এটাই মৃত্যুশয্যা সাব্যস্ত হত!
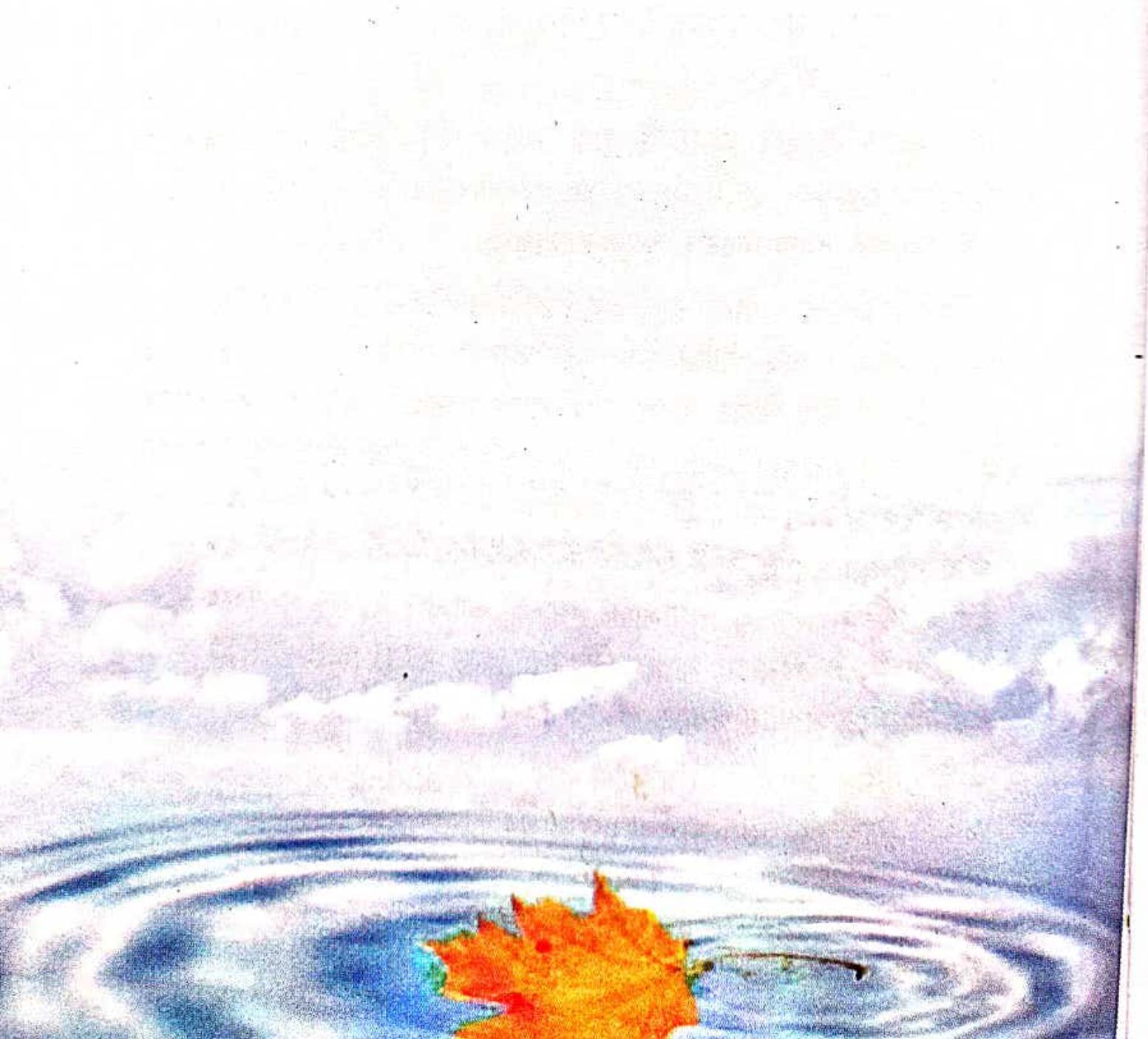
কুরআনের মহব্বত

এই ঘটনা বয়ান করেছেন আমাতুল্লাহ নামের এক মহিলা। তিনি বলেন, আমি হারাম শরীফে মহিলা হাজীদের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। একসময় আমি অবস্থান করছিলাম মহিলা তাঁবুতে। আচানক এক মহিলা আমার কাঁধ স্পর্শ করেন। মহিলা ছিলেন অনারব। আটকে আটকে কথা বলছিলেন তিনি। আমাকে তিনি হাজিয়া হাজিয়া বলে ডাকছিলেন।

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে দেখলাম। একজন মাঝবয়সী মহিলা এবং যথাসম্ভব তিনি তুর্কী। তিনি আমাকে সালাম দিলেন। আমার হাতে ধারণকৃত কুরআন শরীফের দিকে ইশারা করলেন। এরপর ভাঙা ভাঙা আরবীতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কুরআন পড়তে পারেন? আমি বললাম, হাঁ; পারি।

আমার জওয়াব শুনে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল; চোখ থেকে পড়তে লাগল অশ্রু। তাঁর অবস্থা দেখে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। আমিও কাঁদতে লাগলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন?

তিনি ধরা গলায় বললেন, আমি কুরআন পড়তে পারি না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

তিনি জওয়াব দিলেন, আমি এই পবিত্র গ্রন্থ পড়তে শিখিনি।

তাঁর জওয়াব পুরোপুরি শেষও হতে পারল না; তিনি ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম; সাহস দিলাম। বললাম, আপনি এখন আল্লাহর ঘরে আছেন। তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে দোআ করুন, যাতে তিনি আপনাকে কুরআন পড়া শিখিয়ে দেন। আমি আপনাকে কুরআন পড়তে সাহায্য করব।

আমার কথা শুনে তাঁর কান্না বন্ধ হল। আমি জীবনে কখনও এই ঘটনা ভুলতে পারব না। তখনই সেই মহিলা দোআর জন্য হাত তুললেন।

বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার সীনা খুলে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমার স্মরণশক্তি বাড়িয়ে দাও, যাতে আমি কুরআন শিখতে পারি। হে আল্লাহ! তুমি হৃদয়ের পর্দা তুলে দাও, যাতে আমি কুরআন পড়তে পারি।

দোআ শেষ করে তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং খুব অস্থিরতা নিয়ে বললেন, আমি কি কুরআন না পড়েই মারা যাব?

আমি তাঁকে তাসাল্লী দিলাম, ইনশা আল্লাহ! তা হবে না। সত্বর আপনি কুরআন পড়া শিখবেন এবং অনেক বার খতম করবেন।

এরপর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সুরা ফাতেহা পড়তে পারেন? আমার প্রশ্ন শুনে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, হাঁ।

একথা বলে তিনি থেমে পড়তে লাগলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

পড়তে পড়তে সুরা ফাতেহা শেষ করলেন তিনি। এরপর ছোট ছোট কয়েকটি সুরা শোনালেন। সেগুলো তাঁর মুখস্ত ছিল। আমি তাঁর চমৎকার আরবী উচ্চারণ শুনে তাজ্জব হচ্ছিলাম। এরপর তিনি ভাঙা অথচ সুন্দর আরবীতে কথা বলতে থাকলেন। কিন্তু আফসোস! তিনি এই প্রিয় ভাষা কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেননি।

আচানক তাঁর চেহারার রং বদলে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, যদি আমি কুরআন না পড়ে মরে যাই, তা হলে জাহান্নামে চলে যাব। আল্লাহর কসম! আমি কুরআন করীমের ক্যাসেট খরিদ করব। এটা আল্লাহর কালাম। আল্লাহর কালাম সবচেয়ে বড়।

তিনি আল্লাহর ইজ্জত, আযমত বয়ান করতে থাকলেন এবং আমাদের উপর আল্লাহর কিতাবের হক প্রকাশ করতে লাগলেন।

আমি তাঁর কথা শুনে নিজেকে সামলাতে পারলাম না। খুব কাঁদলাম। কেননা, একজন অনারব মহিলা আল্লাহ ও তাঁর আযাবকে এত ভয় করছেন;
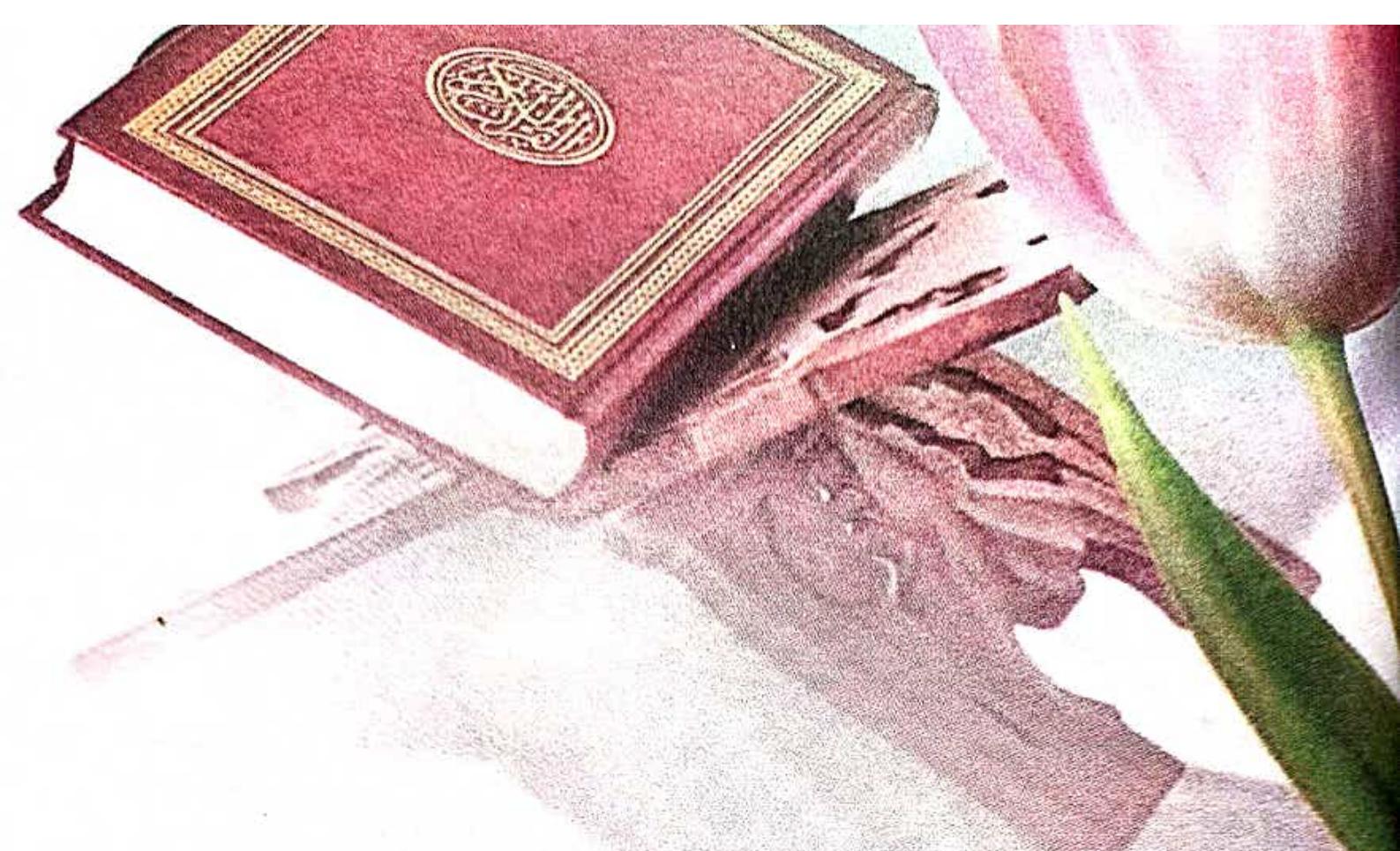
অথচ তিনি কুরআনও পড়েননি। তাঁর জীবনের শেষ তামান্না হচ্ছে এই যে, তিনি কুরআন পড়া শিখবেন। তিনি খুব বিষণ্ন ছিলেন এবং তাঁর শ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছিল। কারণ, তিনি আল্লাহর কিতাব পড়তে পারেন না।

আমরা কি কখনও কুরআনের প্রতি খেয়াল করি? আমরা তো এই কিতাবকে পিছনে ফেলে রেখেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অক্ষয় মোজেযা দান করেছেন; কিন্তু আমরা তা ভুলে গেছি।

আমরা কখনও চিন্তাই করিনি। অথচ আল্লাহ তাআলা কুরআন করীম হিফজ, তেলাওয়াত ও উপলব্ধি করার সমস্ত উপকরণ সহজ করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আমরা দাম্ভিকতা দেখিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার কোন্ বস্তু থেকে প্রেরণা লাভ করবে? আহ! আমাদের চোখ অবনমিত হয় না। আচ্ছা, কুরআন মাজীদের পর আর কী আছে, চোখ অবনমিত করতে পারে। আমাদের অন্তরে কে বিপ্লব সৃষ্টি করবে?

বর্তমান আরব জাহানের বিশিষ্ট দাঈ ডক্টর মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী। খুব কম বয়সেই তিনি বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে আরব-অনারব সর্বত্র সাড়া ফেলে দিয়েছেন। পশ্চিমা দুনিয়ায়ও তিনি এখন এক নামে পরিচিত।

ডক্টর আরিফীর জন্ম ১৯৭০ সালের ১৬ জুলাই। বংশ পরিচয়ে তিনি ইসলামের বিখ্যাত সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু'র উত্তরসূরী। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন দাম্মামে। এরপর সৌদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়াশুনা করেন এবং রিয়াদের বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিএইচডি'র বিষয় ছিল– The Views of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah on Sufism – a Compilation and Study.

মুহাম্মাদ আরিফীর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে কুউদ, শায়খ আবদুর রহমান ইবনে নাসের আল-বাররাক প্রমুখ। তিনি ইলমে ফেকাহ ও ইলমে তাফসীর শিক্ষা করেন শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায রহ.-এর কাছে। ইবনে বায রহ.-এর সোহবতে তিনি প্রায় পনেরো/ষোলো বছর থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ডক্টর আরিফী জীবনের মূল কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছেন 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'কে। এই লক্ষে তিনি বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে থাকেন। এরপরও তিনি রাজধানী রিয়াদের বাদশা সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং আল-বাওয়ারদী জামে মসজিদের খতীব। শুক্রবার জুমার সময় তাঁর মসজিদে তিল ধারণের ঠাঁয় থাকে না।

ডক্টর আরিফী দাওয়াহ বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য। একইভাবে তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইসলামী অর্গানাইজেশনেরও মেম্বার। এসূত্রে রাবেতা আলমে ইসলামী ও বিশ্ব মুসলিম উলামা ঐক্য পরিষদে তাঁর সদস্যপদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুসাহিত্যিক ডক্টর আরিফী একজন সুবক্তা। তাঁর বক্তৃতার কয়েক ডজন অডিও-ভিডিও ক্যাসেট বাজারে পাওয়া যায় এবং সেগুলো থেকে মুসলিম সমাজ অনেক উপকৃত হচ্ছে।

মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়স্ক এই বিজ্ঞ আলেম প্রায় বিশ/পঁচিশটি পুস্তক রচনা করেছেন। সেগুলোর প্রত্যেকটি বিক্রির বেলায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। তবে বক্ষমাণ পুস্তকটি তাঁর অন্যান্য বইয়ের রেকর্ডও ছাড়িয়ে গেছে। দুনিয়ার অনেক ভাষায় অনূদিতও হয়েছে এই বইটি।

আমরা তাঁর নেক হায়াত কামনা করছি।

মৃত্যুর বিছানায়

যিন্দা কওম কখনও নিজের ইতিহাস ভোলে না। তারা সবসময় অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। খোদ কুরআন মাজীদের পয়গামও হচ্ছে এই যে, ইতিহাসকে শুধু বিনোদনের উপকরণ বানানো উচিত নয়; বরং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

এই পুস্তকে আমি ইতিহাস ও বর্তমান যুগের এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছি, যেগুলো শিক্ষার উপকরণ সরবরাহের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন।

978-984-90011-8-8